উদ্বোধন-গ্রন্থাবলী

ভক্তি-রহস্য

স্বামী বিবেকানন্দ

ভক্তি-রহস্য

স্বামী বিবেকানন্দ

অষ্টম সংস্করণ

এক টাকা আট আনা

প্রকাশক—স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্য্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

১৩৫৪

প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স
২০-এ, গৌর লাহা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সূচীপত্র

ভক্তি-রহস্য

প্রথম অধ্যায়

ভক্তির সাধন

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ১।২০।১৯

ভক্তির লক্ষণ

অজ্ঞ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতি আছে, তোমাকে স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন কখনও দূর না হয়।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদের এই উক্তিটিই ভক্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বলিয়া আমাদের মনে হয়।

প্রবৃত্তিসমূহের মোড় ফিরান, অর্থাৎ ঈশ্বরাভিমুখী গতিই ভক্তি

আমরা দেখিতে পাই, সাধারণ মানবগণের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে—ধন, বেশভূষা, স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য বিষয়ে—কি বিজাতীয় প্রীতি, কি ঘোর আসক্তি! তাই ভক্তরাজ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বলিতেছেন, আমি কেবল তোমার প্রতি ঐরূপ প্রবল অনুরাগসম্পন্ন হইব, কেবল তোমাকে ঐরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসিব, আর কাহাকেও নহে। এই প্রীতি, এই আসক্তি ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইলেই তাহাকে ভক্তি আখ্যা প্রদান করা হয়।

ভক্তির আচার্য্যগণ আমাদের প্রবৃত্তিসমূহকে উচ্ছেদ করিতে বলেন না—তাঁহারা বলেন, আমাদের কোন প্রবৃত্তিই বৃথা নহে, বরং ঐগুলির সহায়তায়ই আমরা স্বাভাবিক উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া থাকি। ভক্তি সাধনে কোন প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখিতে হয় না, উহাতে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয় না, উহা কেবল প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া উহাকে উচ্চতর পথে বেগে প্রধাবিত করিয়া দেয়।

আমরা ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে স্বভাবতঃই ভালবাসিয়া থাকি, আর আমরা উহাদিগকে না ভালবাসিয়াও থাকিতে পারি না, কারণ, ওগুলি আমাদের নিকট একমাত্র পরম সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে উচ্চতর বস্তুর সত্যতা বুঝিতে পারি না। ভক্তির আচার্য্যগণ বলেন, যখন মানব ইন্দ্রিয়াতীত—পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জগতের বহির্দ্দেশে অবস্থিত—সত্য বস্তু কিছু দেখিতে পাইবে, তখনও তাহার আসক্তিকে রাখিতে হইবে, কেবল উহাকে বিষয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া সেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে। আর পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে প্রীতি বা অনুরাগ ছিল, তাহা যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহাকেই ভক্তি বলে। রামানুজাচার্য্যের মতে এই প্রবল অনুরাগ বা ভক্তিলাভের জন্য নিম্নলিখিত সাধন-প্রণালী অর্থাৎ উপায়গুলির অনুষ্ঠান করিতে হয়।

প্রথমতঃ 'বিবেক'। এই 'বিবেক' সাধনটি, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য-দেশীয়গণের নিকট একটি অদ্ভুত জিনিস। রামানুজের মতে ইহার

অর্থ "খাদ্যাখাদ্যের বিচার।" যে সকল শক্তিতে দেহ ও মনের সমুদয় বিভিন্ন শক্তি গঠিত হয়, খাদ্যের মধ্যে সেই গুলি বর্ত্তমান—আমি এক্ষণে যেরূপ শক্তির প্রকাশ করিতেছি, তাহার সমুদয়ই আমার ভুক্ত খাদ্যের মধ্যে ছিল—আমার দেহমনের ভিতর যাইয়া উহা অন্য আকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু আমার ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের সহিত আমার দেহমনের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। যেমন বহির্জ্জগতের জড় ও শক্তি আমাদের ভিতর দেহ ও মনের আকার ধারণ করে, তদ্রূপ স্বরূপতঃ দেহ ও খাদ্যের মধ্যেও প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। তাহাই যদি হইল, অর্থাৎ যদি আমাদের খাদ্যের জড়পরমাণুসমূহ হইতে আমরা চিন্তাশক্তির যন্ত্র প্রস্তুত করি, আর ঐ পরমাণুগুলির মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্মতর শক্তিসমূহ হইতে আমরা স্বয়ং চিন্তাকেই গঠন করি, তবে ইহাও সহজেই প্রতীত হইবে যে এই চিন্তাশক্তি ও চিন্তাশক্তির যন্ত্র উভয়ই আমাদের ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইবে—বিশেষ বিশেষ প্রকার খাদ্যে মনের ভিতর বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন উৎপাদন করিবে। আমরা প্রতিদিনই এ বিষয় স্পষ্টতঃই দেখিয়া থাকি। আর কতক প্রকার খাদ্য আছে, তাহারা শরীরে পরিণামবিশেষ উৎপাদন করে, আখেরে মনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় শিক্ষার জিনিস। আমরা যে দুঃখভোগ করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই কেবল, আমরা যেরূপ আহার করি, তাহাতেই হইয়া থাকে। আপনারা দেখিতে পান, অতিরিক্ত ও গুরুপাক ভোজনের পর মনকে সংযম করা বড়ই কঠিন; তখন মন

ভক্তির সাধন— (১) বিবেক

কেবল এদিক্ ওদিক্ দৌড়িতে থাকে। আবার কতকগুলি খাদ্য উত্তেজক—সেইগুলি খাইলেও দেখিবেন, আপনারা মনকে সংযম করিতে পারিবেন না। অধিক পরিমাণে মদ্যপান করিলে লোকে স্পষ্টই দেখিতে পায়, সে সহজে তার মনকে সংযম করিতে পারে না, উহা যেন তাহার আয়ত্তের বাহিরে যাইয়া দৌড়িতে থাকে।

জাতিদোষ

রামানুজাচার্য্যের মতে খাদ্যসম্বন্ধীয় ত্রিবিধ দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ জাতিদোষ। জাতিদোষ অর্থে সেই খাদ্যবিশেষের প্রকৃতিগত দোষ। সর্ব্বপ্রকার উত্তেজক খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথা, মাংস। মাংসাহার ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ, স্বভাবতঃই উহা অপবিত্র। আমরা অপরের প্রাণবিনাশ ব্যতীত মাংস লাভ করিতে পারি না। মাংস খাইয়া আমরা ক্ষণিক সুখলাভ করিয়া থাকি আর আমাদের সেই ক্ষণিক সুখের জন্য একটি প্রাণীকে তাহার প্রাণ দিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, মাংসভোজনের দ্বারা আমরা অপরাপর অনেক মানবের অবনতির কারণ হইয়া থাকি। মাংসাশী প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজে নিজে সেই প্রাণীটিকে হত্যা করিত, তাহা হইলে বরং ভাল হইত। তাহা না করিয়া সমাজ একদল লোক সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা তাঁহাদের এই কাজ করাইয়া লন, আবার সেই কার্য্যের জন্যই সমাজ তাহাদিগকে ঘৃণা করেন। এখানকার আইনের কি বিধান জানি না, কিন্তু ইংলণ্ডে কসাই কখন জুরির আসন গ্রহণ করিতে পারে না—আইন-কর্ত্তাদের মনের ভাব এই, সে স্বভাবতঃই নিষ্ঠুর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে নিষ্ঠুর করিয়াছে কে? সমাজই যে তাহাকে নিষ্ঠুর করিয়াছে। আমরা যদি মাংস

ভক্ষণ না করিতাম, তবে সে কখনই কসাই হইত না। মাংসভক্ষণ কেবল তাহাদেরই চলিতে পারে, যাহাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, আর যাহারা ভক্তিযোগসাধনে প্রবৃত্ত নহে। কিন্তু ভক্ত হইতে গেলে মাংসভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উত্তেজক খাদ্য যথা, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি এবং সাওয়ারক্রুট (Saur-kraut)* প্রভৃতি দুর্গন্ধ খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। আরও পূতি, পর্য্যুষিত এবং যাহার স্বাভাবিক রস প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে, এরূপ সমুদয় খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে।

খাদ্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় দোষের নাম আশ্রয়দোষ। আশ্রয় শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি বা যে বস্তুতে কোন বিশেষ গুণ আশ্রিত রহিয়াছে।

আশ্রয়দোষ

অতএব আশ্রয়দোষ অর্থে বুঝিতে হইবে, যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাদ্য আসিতেছে, তাহার দোষে খাদ্যে যে দোষ জন্মে। হিন্দুদের এই অদ্ভুত মতটি পাশ্চাত্যগণের পক্ষে বুঝা আরো কঠিন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম পদার্থবিশেষ রহিয়াছে। তিনি যাহা কিছু স্পর্শ করেন, তাহাতেই যেন তাঁহার প্রভাব, তাঁহার মনের, তাঁহার চরিত্র বা ভাবের অংশবিশেষ গিয়া পড়ে। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু বহির্গত হইতেছে, তেমনি তাঁহার ভাব, তাঁহার চরিত্রও তাঁহা হইতে বহির্গত হইতেছে আর তিনি যাহা স্পর্শ করেন, তাহাতেই সেই ভাব লাগিয়া যায়। অতএব

---

* ইহা এক প্রকার জার্ম্মানদেশীয় চাটনি। বাঁধাকপি হইতে লবণজল সহযোগে প্রস্তুত।

রন্ধনের সময় কে আমাদের খাদ্য স্পর্শ করিল, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন দুশ্চরিত্র বা মন্দ ব্যক্তি যেন উহা স্পর্শ না করে। যিনি ভক্ত হইতে চান, তিনি, যাঁহাদিগকে অসচ্চরিত্র বলিয়া জানেন, তাহাদের সহিত এক সঙ্গে খাইতে বসিবেন না, কারণ, খাদ্যের মধ্য দিয়া তাঁহার ভিতর অসদ্ভাব সংক্রমিত হইবে।

নিমিত্ত দোষ

তৃতীয় নিমিত্ত দোষ। এই দোষ পরিত্যাগ করা খুব সহজ। নিমিত্ত অর্থে খাদ্যে ধূলি ইত্যাদির সংস্পর্শ হওয়া, তাহা যেন কখন না হয়। বাজার হইতে ছত্রিশ রাজ্যের ধূলিযুক্ত খাবার আনিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিয়া টেবিলের উপর দেওয়া ঠিক নয়। আর এক কথা—লালা দ্বারা কিছু স্পর্শ করা উচিত নয়। ঈশ্বর আমাদিগকে সব জিনিস ধুইবার জন্য যথেষ্ট জল দিয়াছেন, অতএব ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকাইয়া লালা দ্বারা সব জিনিস ছোঁয়া ঘোর কু-অভ্যাস—ইহার মত কদর্য্য অভ্যাস আর কিছু নাই। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (Mucous membrane) শরীরের মধ্যে অতি কোমলাংশ ; এতদুৎপন্ন লালা দ্বারা অতি সহজে সমুদয় ভাব সংক্রমিত হয়। সুতরাং মুখে খাবার তুলিবার সময় ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকান বড় দোষাবহ। তার পর একজন কোন জিনিস আধখানা কামড়াইয়া খাইয়াছে, অপরের তাহা খাওয়া উচিত নহে। একজন একটা আপেলে এক কামড় দিয়া খাইল ও অপরকে বাকিটা খাইতে দিল এরূপ করা উচিত নহে। খাদ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি বর্জ্জন করিলে খাদ্য শুদ্ধ হয়। আহার শুদ্ধি হইলে মনও শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্ব্বদা ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।"

রামানুজাচার্য্য উপনিষদুক্ত উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ব কথিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি আহার শব্দ খাদ্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ী আহারশুদ্ধি, শব্দের অর্থ

উপনিষদের অন্য ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য কিন্তু আহার শব্দের অন্য অর্থ ধরিয়া ঐ বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ'। যাহা কিছু গ্রহণ করা হয়, তাহাই আহার সুতরাং তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহই আহার। আর আহারশুদ্ধি অর্থে নিম্নলিখিত দোষসমূহ বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহের গ্রহণ। প্রথমতঃ, আসক্তিরূপ দোষ ত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সমুদয় বিষয়ে প্রবল আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। সব দেখুন, সব করুন, স্পর্শ করুন, কিন্তু আসক্ত হইবেন না। যখনই মানুষের কোন বিষয়ে তীব্র আসক্তি হয়, তখনই সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে, সে আর আপনি আপনার প্রভু থাকে না, সে দাস হইয়া যায়। যদি কোন রমণী কোন পুরুষের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত হয়, তবে সে সেই পুরুষের দাসী হইয়া পড়ে; পুরুষও তদ্রূপ রমণীর প্রতি আসক্ত হইলে তাহার দাসবৎ হইয়া যায়। কিন্তু দাস হইবার ত কোন প্রয়োজন নাই। একজনের দাস হওয়া অপেক্ষা এই জগতে অনেক বড় বড় জিনিস করিবার আছে। সকলকেই ভালবাসুন, সকলেরই কল্যাণ সাধন করুন, কিন্তু কাহারও দাস হইবেন না। প্রথমতঃ, উহা ত আমাদের নিজেদের চরিত্রহীন করিয়া দেয়, দ্বিতীয়তঃ, উহাতে অপরের প্রতি ব্যবহারে আমাদিগের ঘোরতর স্বার্থপর করিয়া তুলে। এই দুর্ব্বলতার দরুণ আমরা, যাহাদিগকে ভালবাসি,

তাহাদের ভাল করিবার জন্য অপরের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করি। জগতে যত কিছু অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আসক্তিবশতঃ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপ সমুদয় আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, কেবল সৎকর্ম্মে আসক্তি রাখিতে হইবে; কিন্তু সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কোনরূপ ইন্দ্রিয়বিষয় লইয়া যেন আমাদের দ্বেষ উৎপন্ন না হয়। দ্বেষহিংসাই সমুদয় অনিষ্টের মূল আর উহাকে জয় করা বড়ই কঠিন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা ঈর্ষাবিষে জর্জ্জরিত হইতেছি—ইহাই আমাদের প্রায় সমুদয় কার্য্যের অভিসন্ধির মূলে। তৃতীয়তঃ মোহ। আমরা সর্ব্বদাই এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া ভ্রম করিতেছি ও তদনুসারে কার্য্য করিতেছি—আর তাহার ফল এই হইতেছে যে, আমরা নিজেদের দুঃখকষ্ট নিজেরাই সৃষ্টি করিতেছি। আমরা মন্দকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যাহা কিছু ক্ষণকালের জন্য আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে, তাহাকেই সর্ব্বোত্তম বস্তু মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া মাতিতেছি; কিছু পরেই দেখিলাম, তাহা হইতে একটা খুব ঘা খাইলাম, কিন্তু তখন আর ফিরিবার পথ নাই। প্রতিদিনই আমরা এই ভ্রমে পড়িতেছি আর অনেক সময় সারা জীবনটাই আমরা ঐ ভুল লইয়া থাকি। মুহূর্ত্তকালের জন্য ইন্দ্রিয়সুখ-বিধায়ক বলিয়া আমরা অনেক বিষয়কে ভাল বলিয়া মনে করিয়া তাহাতে নিযুক্ত হই আর অনেক বিলম্বে আমাদের ভুল বুঝিতে পারি। শঙ্করাচার্য্যের মতে এই পূর্ব্বোক্ত রাগদ্বেষ-মোহরূপ ত্রিবিধ দোষবর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহের গ্রহণকে

আহারশুদ্ধি বলে। এই আহারশুদ্ধি হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি হয়, অর্থাৎ তখন মন ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া রাগদ্বেষমোহবর্জ্জিত হইয়া উহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে। আর এইরূপ সত্ত্বশুদ্ধি হইলেই সে মনে সর্ব্বদা ঈশ্বরের স্মৃতি বিরাজিত থাকে।

'আহারশুদ্ধি'র উভয় প্রকার অর্থই (শঙ্কর ও রামানুজ উভয়ের ব্যাখ্যাই) গ্রহণীয়

স্বভাবতঃই আপনারা সকলেই বলিবেন যে, এইটিই উৎকৃষ্টতর অর্থ। তাহা হইলেও ইহার সহিত প্রথমোক্ত অর্থটিকেও গ্রহণ করিতে হইবে। স্থূল খাদ্য শুদ্ধ হইলে তারপর অবশিষ্টগুলি হইবে। ইহা অতি সত্য কথা যে, মনই সকলের মূল, কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বদ্ধ নহেন! আপনাদের মধ্যে এমন লোক কে এখানে আছেন, যিনি এক বোতল মদ খাইয়া না টলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন? ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, জড়পদার্থের শক্তিতে আমরা এখনও পরিচালিত, আর যতদিন আমরা জড়পদার্থের শক্তি দ্বারা পরিচালিত, ততদিন আমাদিগকে জড়ের সাহায্য লইতেই হইবে, তারপর আমরা যখন সমর্থ হইব, তখন যাহা খুশি, খাইতে পারি। আমাদিগকে রামানুজের অনুসরণ করিয়া আহার-পান সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক খাদ্যের দিকেও আমাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জড়খাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হওয়া ত অতি সহজ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ব্যাপারের দিকেও দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা হইলে ক্রমশঃ আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সবল হইতে সবলতর হইতে থাকিবে, ভৌতিক প্রকৃতি আপনা আপনিই নষ্ট হইয়া

যাইবে। তখনই এমন সময় আসিবে যে, আপনি দেখিবেন, কোন খাদ্যেই আপনার কিছু অনিষ্ট করিতে পারিতেছে না, শত শত অজীর্ণরোগেও আর আপনাকে চঞ্চল করিতে পারিতেছে না। এক্ষণে যকৃতের সামান্য গোলমালেই আপনাকে পাগল করিয়া তুলে। মুশকিল এইটুকু যে, সকলেই একেবারে লাফ দিয়া উচ্চতম আদর্শকে ধরিতে চায়, কিন্তু লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া কিছু ত হইবে না। তাহাতে আমাদের পা খোঁড়া হইয়া আমরা পড়িয়া মরিব। আমরা এখানে বদ্ধ রহিয়াছি, আমাদিগকে ধীরে ধীরে আমাদের শিকল ভাঙ্গিতে হইবে। রামানুজের মতে এই বিবেক অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্য বিচারই ভক্তির প্রথম সাধন।

ভক্তির সাধন—
(২) বিমোক

ভক্তির দ্বিতীয় সাধনের নাম 'বিমোক'। বিমোক অর্থে বাসনার দাসত্ব মোচন। যিনি ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে চান, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার প্রবল বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুর কামনা করিবেন না। এই জগৎ আমাদিগকে সেই উচ্চতর জগতে লইয়া যাইবার জন্য যতটুকু সাহায্য করে, ততটুকুই ভাল। ইন্দ্রিয়বিষয়সকল উচ্চতর বিষয় লাভে যে পরিমাণে সাহায্য করে, সেই পরিমাণে ভাল। আমরা সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই যে, এই জগৎ উদ্দেশ্যবিশেষ লাভের উপায়স্বরূপ, স্বয়ং উদ্দেশ্য নহে। যদি এই জগৎ আমাদের চরম লক্ষ্য হইত, তবে আমরা এই স্থূলদেহেই অমরত্বলাভ করিতাম, আমরা কখনই মরিতাম না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের চতুর্দ্দিকে লোক মরিতেছে, তথাপি মূর্খতাবশতঃ আমরা ভাবিতেছি, আমরা কখন

মরিব না। ঐ ধারণা হইতেই আমরা ভাবিয়া থাকি, এই জীবনঃ আমাদের চরম লক্ষ্য—আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন লোকের এই অবস্থা। এই ভাব এখনই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই জগৎ যতক্ষণ আমাদের পূর্ণতালাভের উপায়স্বরূপ হয়, ততক্ষণই ইহা ভাল আর যখনই উহা দ্বারা তাহা না হয়, তখন উহা মন্দ, মন্দ বই আর কিছুই নহে। এইরূপ স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, টাকা কড়ি বা বিদ্যা আমাদের ভগবৎপথে উন্নতির সহায়ক হইলে ভাল, কিন্তু যখনই তাহা না হয়, তখন সেগুলি মন্দ বই আর কিছুই নয়। যদি স্ত্রী আমাদিগকে ঈশ্বরপথে সহায়তা করে, তবে তাহাকে সাধ্বী স্ত্রী বলা যায়। এইরূপ পতিপুত্রাদি সম্বন্ধেও। অর্থ যদি মানুষকে অপরের কল্যাণসাধনে সহায়তা করে তবেই তাহার মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। নতুবা উহা কেবল অনিষ্টের মূল আর যত শীঘ্র আমরা উহা ছাড়িয়া দিতে পারি, ততই আমাদের কল্যাণ।

ভক্তির সাধন—(৩) অভ্যাস

তৎপরে সাধন 'অভ্যাস'। আমাদের কর্ত্তব্য—মন যেন সর্ব্বদাই ঈশ্বরাভিমুখে গমন করে, অপর কোন বস্তুর আমাদের মনে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। মন যেন সদাসর্ব্বদা অবিশ্রান্ত তৈলধারার ন্যায় ঈশ্বরচিন্তা করে। ইহা বড় কঠিন কার্য্য; কিন্তু ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা তাহাও করিতে পারা যায়। আমরা এক্ষণে যাহা রহিয়াছি, তাহা অতীত অভ্যাসের ফলস্বরূপ। আবার এখন যেরূপ অভ্যাস করিব, ভবিষ্যতে তদ্রূপ হইব। অতএব আপনাদের যেরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহার বিপরীত অভ্যাস করুন।

একদিকে ফিরিয়া আমাদের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে, অন্যদিকে ফিরুন আর যত শীঘ্র পারেন, ইহার বাহিরে চলিয়া যান। ইন্দ্রিয়বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে আমরা এমন এক অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি যে, আমরা এক মুহূর্তে হাসিতেছি, পরক্ষণেই কাঁদিতেছি, সামান্য তরঙ্গেই আমরা বিচলিত হইতেছি—সামান্য একটা বাক্যের দাস, সামান্য এক টুক্‌রা খাদ্যের দাস হইয়াছি। ইহা অতি লজ্জার বিষয়—আর তথাপি আমরা আপনাদিগকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি আর অনর্থক অনেক বড় বড় কথা বলিয়া থাকি। আমরা সংসারের দাসস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়াভিমুখে যাইয়া আমরা আপনাদিগকে এই অবস্থায় আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে অন্যদিকে গমন করুন—ঈশ্বরের চিন্তা করিতে থাকুন—মন কোনরূপ ভৌতিক বা মানসিক ভোগের চিন্তা না করিয়া যেন কেবল ঈশ্বরের চিন্তা করে। যখন উহা অন্য কোন বিষয়ের চিন্তায় উদ্যত হইবে, তখন উহাকে এমন ধাক্কা দিন, যেন উহা ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। "যেমন তৈল এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় পড়িতে থাকে, যেমন দূরে ঘণ্টাধ্বনি হইলে উহার শব্দ কর্ণে এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় আসিতে থাকে, তদ্রূপ এই মনও এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় যেন ঈশ্বরের দিকে প্রধাবিত হয়।" এই অভ্যাস আবার শুধু মনে মনে করিলেই হইবে না, ইন্দ্রিয়গুলিকেও এই অভ্যাসে নিযুক্ত করিতে হইবে। বাজে কথা না শুনিয়া আমাদিগকে ঈশ্বর সম্বন্ধে শুনিতে হইবে; বাজে কথা না কহিয়া ঈশ্বরবিষয়ক আলাপ করিতে হইবে; বাজে বই না

পড়িয়া ভাল বই—যে সব বইএ ঈশ্বরের কথা আছে—সেই সব বই পড়িতে হইবে।

ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিবার জন্ম এই অভ্যাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায়ক সম্ভবতঃ শব্দ—সঙ্গীত। ভগবান্ ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য্য নারদকে বলিতেছেন,

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীদিগের হৃদয়েও বাস করি না, যেখানে আমার ভক্তগণ গান করেন, আমি তথায়ই অবস্থান করি।

অভ্যাসের প্রধান অঙ্গ—সঙ্গীত

মনুষ্যমনের উপর সঙ্গীতের অসাধারণ প্রভাব—উহা মুহূর্ত্তে মনের একাগ্রতা বিধান করিয়া দেয়। আপনারা দেখিবেন অতিশয় তামসিক জড়প্রকৃতি ব্যক্তিরা—যাহারা এক মুহূর্ত্তও নিজেদের মনকে স্থির করিতে পারে না—তাহারাও উত্তম সঙ্গীতশ্রবণে মোহিত হইয়া থাকে। এমন কি, কুক্কুর, বিড়াল, সর্প, সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণও সঙ্গীতশ্রবণে মোহিত হইয়া থাকে।

ভক্তির সাধন—(৪) ক্রিয়া বা পঞ্চমহাযজ্ঞ

তৎপরের সাধন 'ক্রিয়া'—পরের হিতসাধন। স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বর-স্মৃতি আসিবে না। আমরা যতই অপরের কল্যাণসাধনে চেষ্টা করিব, ততই আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হইবে এবং তাহাতে ঈশ্বর বাস করিবেন। আমাদের শাস্ত্রমতে ক্রিয়া পঞ্চবিধ—উহাদিগকে পঞ্চমহাযজ্ঞ বলে। প্রথম, ব্রহ্মযজ্ঞ—অর্থাৎ স্বাধ্যায়—প্রত্যহ শুভ ও

পবিত্র ভাবোদ্দীপক কিছু কিছু করিতে হইবে। দ্বিতীয়, দেবযজ্ঞ। ঈশ্বর বা দেবতা বা সাধুগণের পূজা বা উপাসনা। তৃতীয়, পিতৃযজ্ঞ—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য। চতুর্থ, নৃযজ্ঞ—মনুষ্যজাতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য। মানুষ যদি দরিদ্র বা অভাবগ্রস্তদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ না করে, তবে তাহার নিজের গৃহে বাস করিবার অধিকার নাই। যে কেহ দরিদ্র ও দুঃখী, তাহার জন্যই যেন গৃহীর গৃহ উন্মুক্ত থাকে—তবেই সে যথার্থ গৃহী। যদি সে কেবল নিজে আর নিজের স্ত্রীর ভোগের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করে তবে সে আর তাহাদের দুজন ছাড়া জগতে আর কাহারও জন্য চিন্তাও করিল না—ইহা অতি ঘোর স্বার্থপর কার্য্য হইল, সুতরাং সে ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্ত হইতে পারিবে না। কোন ব্যক্তির নিজের জন্য পাক করিবার অধিকার নাই, অপরের জন্যই তাহাকে পাক করিতে হইবে—অপরের সেবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই তাহার অধিকার। ভারতে সাধারণতঃই ইহা ঘটিয়া থাকে যে, যখন বাজারে নূতন নূতন জিনিস, যথা—আম, কুল প্রভৃতি উঠে তখন কোন ব্যক্তি খুব বেশী পরিমাণে উহা কিনিয়া গরীবদের বিলাইয়া থাকেন। গরীবদের বিলাইবার পর তবে তিনি খাইয়া থাকেন আর এদেশে (আমেরিকায়)ও ঐ সৎদৃষ্টান্তের অনুসরণ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে জীবন নিয়মিত করিতে থাকিলে মানুষ ক্রমশঃ নিঃস্বার্থ হইতে থাকে। আবার স্ত্রীপুত্রাদিরও ইহাতে সর্ব্বদা শিক্ষা হয়। প্রাচীনকালে হিব্রুরা প্রথম জাত ফল ভগবানকে নিবেদন করিত, কিন্তু আজকাল আর বোধ হয় তাহা করে না। সকল বস্তুর অগ্রভাগ দরিদ্রগণের প্রাপ্য—আমাদের উহার

অবশিষ্টাংশে মাত্র অধিকার। দরিদ্রগণ—যাহারা কোনরূপ দুঃখকষ্ট পাইতেছে—তাহারাই ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ। অপরকে না দিয়া, যে ব্যক্তি নিজ রসনার তৃপ্তিসাধন করে, সে পাপ ভোজন করে। পঞ্চম, ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ তির্য্যগ্‌জাতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য। এই সকল প্রাণীকে মানুষ মারিয়া ফেলিবে, তাহাদিগকে লইয়া যাহা খুশি করিবে—এই জন্যই তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে, একথা বলা মহাপাপ। যে শাস্ত্রে এই কথা বলে, তাহা শয়তানের শাস্ত্র, ঈশ্বরের নহে। শরীরের মধ্যে স্নায়ুবিশেষ নড়িতেছে কি না দেখিবার জন্য জন্তুসমূহকে কাটিয়া দেখা—কি বীভৎস ব্যাপার ভাবুন দেখি। এমন সময় আসিবে যখন সকল দেশেই যে ব্যক্তি এরূপ করিবে, সেই দণ্ডনীয় হইবে। আমরা যে বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে রহিয়াছি, তাহার নিকট হইতে ইহারা যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হউক না, হিন্দুরা যে এ বিষয়ে সহানুভূতি করেন না, ইহাতে আমি পরম সুখী। যাহা হউক, আহারের একভাগ পশুগণেরও প্রাপ্য। তাহাদিগকে প্রত্যহ খাদ্য দিতে হইবে। এ দেশের প্রত্যেক শহরে অন্ধ, খঞ্জ বা আতুর, অশ্ব, গো, কুক্কুর, বিড়ালের জন্য হাঁসপাতাল থাকার প্রয়োজন—তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইবে এবং যত্ন করিতে হইবে।

ভক্তির সাধন —(৫) কল্যাণ অর্থাৎ সত্য, আর্জ্জব, দয়া, অহিংসা, দান ও অনভিধ্যা

তার পরের সাধন 'কল্যাণ' অর্থাৎ পবিত্রতা। নিম্নলিখিত গুণগুলি কল্যাণশব্দবাচ্য। ১ম, সত্য। যিনি সত্যনিষ্ঠ, তাঁহার নিকট সত্যের ঈশ্বর প্রকাশিত হন—কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে সত্যসাধন করিতে হইবে। ২য়, আর্জ্জব—অকপটভাব, সরলতা—হৃদয়ের মধ্যে কোনরূপ কুটিলতা থাকিবে না—মন মুখ এক

করিতে হইবে। যদিও একটু কর্কশ ব্যবহার করিতে হয়, তথাপি কুটিলতা ছাড়িয়া সরল সিধা পথে চলা উচিত। ৩য়, দয়া। ৪র্থ, অহিংসা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর অনিষ্টাচরণ না করা। ৫ম, দান। দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আর নাই। সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম ব্যক্তি যে নিজের দিকে হাত ফিরাইয়া আছে ; সে প্রতিগ্রহ করিতে, অপরের নিকট দান লইতে ব্যস্ত। আর সে-ই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যাহার হাত অপরের দিকে ফিরান রহিয়াছে—যে অপরকে দিতেই ব্যাপৃত। হস্ত নির্ম্মিত হইয়াছে ঐ জন্য—কেবল দিবার জন্য। উপবাসে মরিতে হয় সেও শ্রেয়ঃ, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক টুক্রা রুটি আপনার নিকট থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দিতে বিরত হইবেন না! যদি অপরকে দিতে গিয়া অনাহারে আপনার মৃত্যু হয়, তবে আপনি এক মুহূর্ত্তেই মুক্ত হইয়া যাইবেন। তৎক্ষণাৎ আপনি পূর্ণ হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি ঈশ্বর হইয়া যাইবেন যাহাদের এক পাল ছেলে, তাহারা পূর্ব্ব হইতেই বদ্ধ। তাহারা দানা করিতে পারে না। তাহারা ছেলেদের লইয়া সুখী হইতে চায়, সুতরাং তাহাদিগকে সেই ভোগের জন্য পয়সা খরচ করিতে হইবে। জগতে কি যথেষ্ট ছেলেপিলে নাই? কেবল স্বার্থপরতাবশেই লোকে বলিয়া থাকে, আমার নিজের একটি ছেলের দরকার। ৬ষ্ঠ, অনভিধ্যা—পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ বা নিষ্ফল চিন্তা পরিত্যাগ বা পরকৃত অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যাগ।

তৎপরের সাধন 'অনবসাদ'—ইহার ঠিক শব্দার্থ—চুপ করিয়া বসিয়া না থাকা, নৈরাশ্যগ্রস্ত না হওয়া। অর্থাৎ সন্তোষ। নৈরাশ্য আর যাহাই হউক, উহা ধর্ম্ম নহে। সর্ব্বদাই সন্তোষে, সর্ব্বদাই

হাস্য বদনে থাকিলে কোন স্তবস্তুতি বা প্রার্থনা অপেক্ষা শীঘ্র ঈশ্বরের নিকট যাওয়া যায়। যাহাদের মন সর্ব্বদা বিষণ্ণ ও তমোভাবাচ্ছন্ন, তাহারা আবার ভক্তিপ্রেম করিবে কি করিয়া? যদি তাহারা ভক্তি বা প্রেমের কথা কয়, তবে জানিবেন, উহা মিথ্যা—তাহারা প্রকৃত-পক্ষে অপরকে খুন করিতে চায়। এই সব গোঁড়াদের বিষয় ভাবিয়া দেখুন, তাহাদের সর্ব্বদা মুখ ভার হইয়াই আছে—তাহাদের সমুদয় ধর্ম্মটাই এই যে, বাক্যে ও কার্য্যে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করা। ইতিহাসে তাহাদের সম্বন্ধে কি বলে, তাহা ভাবিয়া দেখুন এবং এখনই বা তাহারা বাগে পাইলে কি করিত, তাহাও ভাবুন। তাহারা সমগ্র জগৎকে শোণিত-স্রোতে ভাসাইয়া দিতে পারে যদি তাহাতে তাহারা ক্ষমতা লাভ করিতে পারে, কারণ, পৈশাচিক ভাবই তাহাদের ঈশ্বর। তাহারা উপাসনা করিয়া ও সর্ব্বদা মুখভার করিয়া থাকায় তাহাদের হৃদয়ে আর প্রেমের লেশমাত্র থাকে না, তাহাদের কাহারও প্রতি এক বিন্দু দয়া থাকে না। অতএব যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই আপনাকে দুঃখিত বোধ করে, সে কখনই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিবে না। 'হায়, আমার কি কষ্ট' এরূপ সর্ব্বদা বলা ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে, ইহা পৈশাচিকতা! সকল ব্যক্তিকেই নিজের নিজের দুঃখের বোঝা বহন করিতে হয়। যদি আপনার বাস্তবিকই দুঃখ থাকে, সুখী হইবার চেষ্টা করুন, দুঃখকে জয় করিবার চেষ্টা করুন। দুর্ব্বল ব্যক্তি কখন ভগবানকে লাভ করিতে পারে না।—অতএব দুর্ব্বল হইবেন না। আপনাকে বীর্য্যবান হইতে হইবে—অনন্ত শক্তি যে আপনার ভিতরে। বীর্য্যশালী না হইলে

ভক্তির সাধন — (৬) অনবসাদ

আপনি কোন কিছু জয় করিবেন কিরূপে? আপনি ঈশ্বরলাভ করিবেন কিরূপে?

সঙ্গে সঙ্গে আবার 'অনুদ্ধর্ষ' সাধন করিতে হইবে। উদ্ধর্ষ অর্থে অতিরিক্ত আমোদ প্রমোদ—উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ভক্তির সাধন —(৭) অনুদ্ধর্ষ

অতিরিক্ত আমোদে মাতিলে মন কখনই শান্ত হয় না, চঞ্চল হইয়া থাকে আর পরিণামে সর্ব্বদা দুঃখই আসিয়া থাকে। কথায় বলে, 'যত হাসি তত কান্না।' মানুষ একবার একদিকে ঝুঁকিয়া আবার তাহার চূড়ান্ত বিপরীত দিকে গিয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বদাই হইতেছে। মনকে আনন্দপূর্ণ অথচ শান্ত রাখিতে হইবে। মন কখন যেন কোন কিছুর বাড়াবাড়ি না করে, কারণ, বাড়াবাড়ি করিলেই পরিণামে তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে।

রামানুজের মতে এই গুলিই ভক্তির সাধন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভক্তির প্রথম সোপান—তীব্র ব্যাকুলতা

ভক্তিযোগের আচার্য্যগণ ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন—ঈশ্বরে পরম অনুরক্তি। কিন্তু 'মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসিবে কেন' এই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা ইহা বুঝিতেছি, ততক্ষণ ভক্তিতত্ত্বের কিছুই ধারণা করিতে পারিব না। জগতে দুই প্রকার সম্পূর্ণ পৃথক জীবনের আদর্শ দেখা যায়। সকল দেশের সকল ব্যক্তিই—যাহারা কোনরূপ ধর্ম্ম মানে, তাহারাই স্বীকার করিয়া থাকে, মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টিস্বরূপ। কিন্তু মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশে সাধারণতঃ মানবের দেহভাগটার দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়—ভারতীয় ভক্তিতত্ত্বের আচার্য্যগণ কিন্তু মানবের আধ্যাত্মিক দিক্‌টার দিকে অধিক জোর দিয়া থাকেন আর ইহাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভেদের মূল বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, সাধারণ ব্যবহৃত ভাষায় পর্য্যন্ত এই ভেদ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে বলিয়া থাকে, অমুক ব্যক্তি 'তাহার আত্মাকে পরিত্যাগ করিল' (Gave up the ghost), ভারতে মৃত্যুর কথা বলিতে গেলে অমুক 'দেহ ত্যাগ করিল', এইরূপ বলিয়া

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির মূল প্রভেদ—পাশ্চাত্য দেহবাদী, প্রাচ্য আত্মবাদী

থাকে; পাশ্চাত্যদিগের ভাব যেন মানুষ একটা দেহ, আর তাহার আত্মা আছে, আর প্রাচ্যভাব এই—মানুষ আত্মাস্বরূপ—তাহার দেহ আছে। এই পার্থক্য হইতে অনেক জটিল সমস্যা আসিয়া পড়ে। সহজেই ইহা বুঝা যাইতেছে যে, যে মতে বলে—মানুষ দেহস্বরূপ আর তাহার একটি আত্মা আছে, সে মতে দেহের দিকেই সমুদয় ঝোঁক দেওয়া হয়। যদি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মানুষের জীবন কি জন্য, তাহারা বলিবে—ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য, দেখিব, শুনিব, বুঝিব, ভোজনপান করিব, অনেক বিষয় ধন-দৌলতের অধিকারী হইব—বাপ মা, আত্মীয় স্বজন সব থাকিবে—তাঁহাদের সহিত আনন্দ করিব—ইহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য—ইহার অধিক আর সে যাইতে পারে না; ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর কথা বলিলেও সে উহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। তাহার পরলোকের ধারণা এই যে, এখন যে সকল ইন্দ্রিয়সুখভোগ হইতেছে, সেইগুলিই বরাবর চলিবে। ইহলোকেই যে সে চিরকাল এই ইন্দ্রিয়-সুখভোগ করিতে পারিবে না, তাহাতে সে বড়ই দুঃখিত। সে মনে করে, যে কোনরূপে হউক, সে এমন এক স্থানে যাইবে, যেখানে এই সব সুখই পুনরায় চলিবে। সেই সব ইন্দ্রিয়ই থাকিবে, সেই সব সুখভোগ থাকিবে—কেবল সুখের তীব্রতা ও মাত্রা বাড়িবে মাত্র। সে যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যায়, তাহার কারণ এই যে, ঈশ্বর তাহার এই উদ্দেশ্য লাভের উপায়স্বরূপ। তাহার জীবনের লক্ষ্য—বিষয়সম্ভোগ—সে কাহারও নিকট হইতে জানিয়াছে, একজন পুরুষ আছেন—যিনি তাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সব সুখভোগ দিতে পারেন—তাই সে ঈশ্বরের উপাসনা করে। এই ত গেল এক

ভাব। অপর ভাব এই যে, ঈশ্বরই আমাদের জীবনের লক্ষ্যস্বরূপ। ঈশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই আর এই যে সব ইন্দ্রিয়-সুখভোগ—এগুলির ভিতর দিয়া আমরা উচ্চতর বস্তু লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছি মাত্র। শুধু তাহাই নহে; যদি ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া আর কিছু না থাকিত, তবে ভয়ানক ব্যাপার হইত। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই, যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সুখভোগ যত অল্প, তাহার জীবন ততই উচ্চতর। ঐ কুকুরটার কথা ধরুন—ও এখন খাইতেছে—কোন মানুষ অত তৃপ্তির সহিত খাইতে পারে না। ঐ শূকরশাবকটার দিকে দেখুন—সে খাইতে খাইতে কি আনন্দসূচক ধ্বনি করিতেছে! এমন কোন মানুষ জন্মায় নাই, যে ঐরূপ খাইতে পারে। তির্য্যগজাতির দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি কতদূর প্রবল ভাবিয়া দেখুন—তাহাদের সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলিই পরম উৎকর্ষ-প্রাপ্ত। মানুষের ঐরূপ ইন্দ্রিয়শক্তি কখন হইতে পারে না। পশুগণের ইন্দ্রিয়সুখভোগে বিজাতীয় আনন্দ—তাহারা আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। আর মানুষ যত অনুন্নত হয়, সে ইন্দ্রিয়সুখভোগে তত অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। যতই উচ্চতর অবস্থায় যাইতে থাকিবেন, ততই যুক্তিবিচার ও প্রেম আপনাদের লক্ষ্য হইবে—দেখিবেন, আপনাদের বিচার শক্তি ও প্রেমের বিকাশ হইতেছে আর আপনারা ইন্দ্রিয়-সুখভোগের শক্তি হারাইতেছেন। এই বিষয়টি আমি বিস্তৃতভাবে বুঝাইতেছি। যদি আমরা স্বীকার করি যে, মানুষের ভিতর একটা নির্দ্দিষ্ট শক্তি আছে, আর সেই শক্তিটা হয় দেহের উপর, নয় মনের উপর, নয় আত্মার উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে যদি উহাদের একমতের উপর

সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করা যায়, তবে অন্যগুলির উপর প্রয়োগ করিবার শক্তি ততটুকু কম পড়িয়া যাইবে। সভ্য জাতিদিগের অপেক্ষা অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বা অসভ্য জাতিদের ইন্দ্রিয়শক্তি তীক্ষ্ণতর—আর বাস্তবিক পক্ষে আমরা ইতিহাস হইতে এই একটি শিক্ষা পাইতে পারি যে, কোন জাতি যতই সভ্য হয়, ততই তাহার স্নায়ু তীক্ষ্ণতর হইতে থাকে—আর তাহার শরীর দুর্ব্বলতর হইয়া যায়। কোন অসভ্য জাতিকে সভ্য করুন—দেখিবেন, ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটিতেছে। তখন অন্য কোন অসভ্য জাতি আসিয়া আবার তাহাকে জয় করিবে। দেখা যায় বর্ব্বর জাতিই প্রায় সর্ব্বদাই জয়শালী হয়। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, যদি আমাদের বাসনা হয়, আমরা সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিব—তবে বুঝিতে হইবে, আমরা অসম্ভব বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছি—কারণ, তাহা পাইতে গেলে আমাদিগকে পশু হইতে হইবে। মানুষ যখন বলে, সে এমন এক স্থানে যাইবে যথায় তাহার ইন্দ্রিয়সুখভোগ তীব্রতর হইবে, তখন সে জানে না, সে কি চাহিতেছে—মনুষ্যজন্ম ঘুচিয়া পশুজন্ম লাভ হইলে তবেই তাহার পক্ষে এরূপ সুখভোগ সম্ভবপর। শূকর কখন মনে করে না, সে অশুচি বস্তু ভোজন করিতেছে। উহাই তাহার স্বর্গ। আর যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, সে তাঁহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। ভোজনেই তাহার মনপ্রাণ—সমগ্র সত্তা নিয়োজিত।

সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়-সুখসম্ভোগ শক্তির হ্রাস

মানবের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তাহারা শূকরশাবকের মত বিষয়রূপ গভীর পঙ্কে লুণ্ঠিত হইতেছে—উহার বাহিরে কি আছে, তাহা আর

দেখিতে পাইতেছে না। তাহারা ইন্দ্রিয়-সুখভোগই চায়, আর উহার অপ্রাপ্তি তাহাদের নিকট স্বর্গচ্যুতিস্বরূপ। উচ্চতম অর্থে ধরিলে এইরূপ ব্যক্তিগণ 'ভক্ত' শব্দবাচ্য হইতে পারে না—তাহারা কখন প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক হইতে পারে না। আবার ইহাও বলি, যদি এই নিম্নতর আদর্শের অনুসরণ করা যায়, তবে কালে এই আদর্শটিই বদলিয়া যাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিবে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এমন কোন বস্তু রহিয়াছে যাহার সম্বন্ধে আমি জানিতাম না—তখন জীবনের উপর এবং বিষয়সমূহের উপর প্রবল মমতা ধীরে ধীরে নষ্ট হইবে; বাল্যকালে যখন আমি স্কুলে পড়িতাম, তখন অপর একটি সহপাঠির সঙ্গে একটা খাবার লইয়া ঝগড়া হইয়াছিল; তার গায়ে আমার চেয়ে বেশী জোর ছিল, কাজে কাজেই সে ঐ খাবারটা আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইল। তখন আমার মনে যে ভাব হইল, তাহা এখনও আমার স্মরণ আছে। আমার মনে হইল, তাহার মত দুষ্ট ছেলে আর জগতে জন্মায় নাই—আমি যখন বড় হইব, তখন তাহাকে জব্দ করিব। মনে হইতে লাগিল, সে এত দুষ্ট, তাহার যে কি শাস্তি দিব, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না—তাহাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত—তাহাকে চার টুক্‌রা করিয়া ফেলা উচিত। এখন আমরা উভয়েই বড় হইয়াছি—উভয়ের মধ্যেই এখন পরম বন্ধুত্ব। এইরূপ এই সমগ্র জগৎ অল্পবয়স্ক শিশুতুল্য জনগণে পূর্ণ—পানাহারকেই তাহারা সর্ব্বস্ব বলিয়া জানে—লুচি মণ্ডাই তাহাদের সর্ব্বস্ব—উহার যদি এতটুকু এদিক্ ওদিক্ হয়, তবেই তাহাদের সর্ব্বনাশ। তাহারা কেবল ঐ লুচি মণ্ডারই স্বপ্ন দেখিতেছে আর তাহাদের

আমাদের স্বর্গের ধারণা

ধারণা স্বর্গ এমন জিনিষ যেখানে প্রচুর লুচি মণ্ডা আছে। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানগণের ধারণা—স্বর্গ একটি বেশ ভাল মৃগয়ার স্থান—তাহাদের বিষয় ভাবিয়া দেখুন। আমাদের সকলেরই স্বর্গের ধারণা—নিজ নিজ বাসনার অনুরূপ—কিন্তু কালে আমাদের বয়স যতই বাড়িতে থাকে এবং যতই উচ্চতর বস্তু দর্শনের শক্তি হয়, ততই আমরা সময়ে সময়ে এই সমুদয়ের অতীত উচ্চতর বস্তুর চকিত আভাস পাইতে থাকি। আধুনিক কালে সাধারণতঃ যেমন সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া এই সব ধারণা অতিক্রম করা হয়, আমি সেরূপ ভাবে এই সকল ধারণা পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি না—তাহাতে সব উড়াইয়া দেওয়া হইল—সব ভাবগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলা হইল—নাস্তিক যে এইরূপে সমুদয় উড়াইয়া দেয়, সে ভ্রান্ত; কিন্তু ভক্ত যিনি, তিনি উহা অপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। নাস্তিক স্বর্গে যাইতে চাহে না, কারণ, তাহার মতে স্বর্গই নাই; আর ভগবদ্ভক্ত স্বর্গে যাইতে চাহেন না, কারণ তিনি উহাকে ছেলে-খেলা বলিয়া মনে করেন। তিনি চাহেন কেবল ঈশ্বরকে, আর ঈশ্বর ব্যতীত জীবনের শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর-স্বয়ংই মানবের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য—তাঁহাকে দর্শন করুন, তাঁহাকে সম্ভোগ করুন। আমরা ঈশ্বর হইতে উচ্চতর বস্তুর ধারণাই করিতে পারি না, কারণ, ঈশ্বর পূর্ণ-স্বরূপ। প্রেম হইতে কোনরূপ উচ্চতর সুখ আমরা ধারণা করিতে পারি না, কিন্তু এই শব্দ নানা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহাতে সংসারের সাধারণ স্বার্থপর ভালবাসা বুঝায় না—ঐ ভালবাসাকে প্রেম নামে অভিহিত করা নাস্তিকতা বই আর কিছুই নহে। আমাদের পুত্র-

কলত্রাদির প্রতি ভালবাসা পাশবিক ভালবাসা মাত্র। যে ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, তাহাই একমাত্র প্রেমশব্দবাচ্য এবং তাহা কেবল ঈশ্বরের প্রতিই হওয়া সম্ভব। এই প্রেম লাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার। আমরা পিতামাতা পুত্রকন্যা ও অন্যান্য সকলকে ভালবাসিতেছি—এই সকল বিভিন্ন প্রকার ভালবাসা বা আসক্তির ভিতর দিয়া চলিতেছি। আমরা ধীরে ধীরে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন করিতেছি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ঐ বৃত্তির পরিচালনা হইতে কিছুই শিখিতে পারি না—কেবল একটি মাত্র সোপানে আরোহণ করিয়াই আমাদের গতি অবরুদ্ধ হয়, আমরা এক ব্যক্তিতে আসক্ত হইয়া পড়ি। কখন কখন মানব এই বন্ধন অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া থাকে। লোক এই জগতে চিরকাল ধরিয়া স্ত্রী পুত্র ধন মান এই সবের দিকে দৌড়িতেছে—সময়ে সময়ে তাহারা বিশেষ ধাক্কা খাইয়া সংসারটা যথার্থ কি, তাহা বুঝিতে পারে। এই জগতে কেহই ঈশ্বর ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। মানুষ দেখিতে পায়, মানুষের ভালবাসা সব ভূয়া। মানুষে ভালবাসিতে পারে না—তাহারা কেবল বাক্যবাগীশ মাত্র। "আহা প্রাণনাথ, আমি তোমায় বড় ভালবাসি" বলিয়া পত্নী পতিকে চুম্বন করিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু স্বামীর যেই মৃত্যু হয়, অমনি সে তাঁহার টাকার সিন্ধুকের চাবির সন্ধান করে, আর কাল তাহার কি গতি হইবে, এই ভাবিয়া আকুল হয়। স্বামীও স্ত্রীকে খুব ভালবাসিয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রী অসুস্থ হইলে, রূপ-যৌবন হারাইয়া কুৎসিতাকৃতি

ঈশ্বরপ্রেম ব্যতীত সকল ভালবাসাই কপটতাময়

হইলে, অথবা সামান্য দোষ করিলে আর তাহার দিকে চাহিয়াও দেখেন না। জগতের সব ভালবাসা অন্তঃসারশূন্য ও কপটতাময় মাত্র।

সান্ত জীব কখন ভালবাসিতে পারে না, অথবা সান্ত জীবও ভালবাসার যোগ্য হইতে পারে না। প্রতি মুহূর্ত্তেই যখন, যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার দেহের পরিবর্ত্তন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন এই জগতে অনন্ত প্রেমের আর কি আশা করেন? ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও প্রতি প্রেম হইতে পারে না। তবে এ সব ভালবাসাবাসি—এগুলির অর্থ কি? এগুলি কেবল ভ্রমমাত্র। মহাশক্তি আমাদের পশ্চাৎদেশ হইতে আমাদিগকে ভালবাসিবার জন্য প্রেরণা দিতেছেন—আমরা জানি না—কোথায় সেই প্রেমাস্পদ বস্তু খুঁজিব—কিন্তু এই প্রেমই আমাদিগকে উহার অনুসন্ধানে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। আমরা বারংবার আমাদের ভ্রম প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমরা একটা জিনিস ধরিলাম—উহা আমাদের হাত ফস্‌কিয়া গেল, তখন আমরা আর কিছুর জন্য হাত বাড়াইলাম। এইরূপ অনেক টানাপড়েনের পর আলোক আসিয়া থাকে। তখন আমরা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হই—একমাত্র যিনি আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসিয়া থাকেন। তাঁহার ভালবাসার কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই—আর তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। আমি আপনার অনিষ্ট করিতে থাকিলে আপনাদের মধ্যে যে কেহই হউন, কতক্ষণ আমার অত্যাচার সহ্য করিবেন? যাহার মনে ক্রোধ, ঘৃণা বা ঈর্ষা নাই, যাহার সাম্যভাব কখন

অনন্ত নির্ব্বিকার ঈশ্বরই যথার্থ প্রেমের পাত্র

নষ্ট হয় না, যিনি অজ, অবিনাশী,—ঈশ্বর ব্যতীত তিনি আর কি?

ঈশ্বরলাভ অতি কঠিন ব্যাপার

তবে ঈশ্বরকে লাভ করা বড় কঠিন—এবং তাঁহার নিকট যাইতে হইলে বহু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়—অতি অল্প লোকই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে। ঈশ্বরপথে আমরা শিশুতুল্য হাত পা ছুড়িতেছি মাত্র। লক্ষ লক্ষ লোকে ধর্ম্মের ব্যবসাদারি করিয়া থাকে —খুব অল্প লোকেই প্রকৃত ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকে। সকলেই ধর্ম্মের কথা কয়, কিন্তু খুব কম লোকেই ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। এক শতাব্দীর ভিতর অতি অল্প লোকেই সেই ঈশ্বর-প্রেমলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু যেমন এক সূর্য্যের উদয়ে সমুদায় অন্ধকার তিরোহিত হয়, তদ্রূপ এই অল্পসংখ্যক যথার্থ ধার্ম্মিক ও ভগবদ্ভক্ত পুরুষের অভ্যুদয়ে সমগ্র দেশ ধন্য ও পবিত্র হইয়া যায়। জগদম্বার সন্তানের আবির্ভাবে দেশকে দেশ পবিত্র হইয়া যায়। এক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র জগতে এরূপ লোক খুব কম জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু আমাদের সকলেরই ঐরূপ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে আর আপনি বা আমিই যে সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে নই, তাহা কে বলিল? অতএব আমাদিগকে ভক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বলিয়া থাকি, স্ত্রী তাহার স্বামীকে ভালবাসিতেছে—স্ত্রীও ভাবে, আমি স্বামিগতপ্রাণা। কিন্তু যেই একটি ছেলে হইল, অমনি অর্দ্ধেক বা তাহারও অধিক ভালবাসা ছেলেটির প্রতি গেল। সে নিজেই টের পাইবে যে, স্বামীর প্রতি তাহার আর পূর্ব্বের মত ভালবাসা নাই। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, যখন অধিক ভালবাসার বস্তু আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্বের ভালবাসা

ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। যখন আপনারা স্কুলে পড়িতেন, তখন আপনারা আপনাদের কয়েকজন সহপাঠীকেই জীবনের পরম প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন অথবা বাপ মাকে ঐরূপ ভালবাসিতেন, তারপর বিবাহ হইল—তখন স্বামী ও স্ত্রীই পরম প্রীতির আস্পদ হইল—পূর্ব্বের ভাব চলিয়া গেল—নূতন প্রেম প্রবলতম হইয়া দাঁড়াইল। আকাশে একটি তারা উঠিয়াছে, তারপর তদপেক্ষা একটি বৃহত্তর নক্ষত্র উঠিল, তারপর তদপেক্ষা আর একটি বৃহত্তর নক্ষত্রের উদয় হইল—অবশেষে সূর্য্য উঠিল—তখন সূর্য্যের প্রকাশে ক্ষুদ্রতর জ্যোতিগুলি ম্লান হইয়া গেল। ঈশ্বরই সেই সূর্য্য। এই তারাগুলি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক ভালবাসা। আর যখন ঐ সূর্য্যের উদয় হয়, তখন মানুষ উন্মাদ হইয়া যায়—ঐরূপ ব্যক্তিকে এমার্সন "ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত মানব" (A God-intoxicated man) বলিয়াছেন। তখন তাহার নিকট মানুষ জীবজন্তু সব রূপান্তরিত হইয়া গিয়া ঈশ্বররূপে পরিণত হয়—সমুদয়ই সেই এক প্রেম সমুদ্রে ডুবিয়া যায়। সাধারণ প্রেম কেবল পাশব আকর্ষণমাত্র। তাহা না হইলে প্রেমে স্ত্রী পুরুষ ভেদের কি প্রয়োজন? মূর্ত্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া হাত জোড় করিলে তাহা ঘোর পৌত্তলিকতা, কিন্তু স্বামীর বা স্ত্রীর সামনে ঐরূপে হাঁটু গাড়িয়া হাত জোড় অনায়াসে করা যাইতে পারে—তাহাতে কোন দোষ নাই।

এই সবের ভিতর দিয়া গিয়া আমাদিগকে উহাদের বাহিরে যাইতে হইবে। প্রথমে আপনাদের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে—আপনি জীবনটাকে যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তদনুসারে আপনার ভালবাসাও দাঁড়াইবে। এই সংসারই জীবনের চরম গতি

—এইটি ভাবাই পশুজনোচিত ও মানবের ঘোরতর অবনতিসাধক। যে কোন ব্যক্তি এই ধারণা লইয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হয়, সে-ই ক্রমে হীনত্ব প্রাপ্ত হয়। সে কখনও উচ্চভাবে আরোহণ করিতে পারিবে না, সে সেই জগতের অন্তরালে অবস্থিত তত্ত্বের চকিত আভাসও কখন পাইবে না, সে সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিবে। সে কেবল টাকার চেষ্টা করিবে—যাহাতে সে ভাল করিয়া লুচি মণ্ডা খাইতে পায়। এরূপ জীবন-যাপনাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সংসারের দাস, ইন্দ্রিয়ের দাস—আপনারা জাগুন—ইহাপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব আরও কিছু আছে। আপনারা কি মনে করেন, এই মানবের—এই অনন্ত আত্মার—চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিবার জন্যই জন্ম? ইহাদের পশ্চাতে অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন, তিনি সব করিতে পারেন, সব বন্ধন ছেদন করিতে পারেন—প্রকৃতপক্ষে আপনিই সেই আত্মা আর প্রেমবলেই আপনার ঐ শক্তির উদয় হইতে পারে। আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত ইহা আমাদের আদর্শস্বরূপ। মনে করিলেই ফস্ করিয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা কল্পনায় মনে করিতে পারি, আমরা ঐ অবস্থা পাইয়াছি, কিন্তু তাহা কল্পনামাত্র বই আর কিছুই নহে—ঐ অবস্থা এখন বহু, বহু দূরে। মানব এক্ষণে যে অবস্থায় রহিয়াছে, তাহার অবস্থা ও অধিকার বুঝিয়া যদি সম্ভব হয়, তাহার উচ্চপথে গতির জন্য সাহায্য করিতে হইবে। মানব সাধারণতঃ জড়বাদী—আপনি

আমাদের চরম লক্ষ্য ইন্দ্রিয়-সুখ নহে—পরমাত্মা; তাহা হইলেও আমাদের অধিকার ও অবস্থা বুঝিয়া জড়ের সাহায্য লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে

আমি সকলেই জড়বাদী। আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি, বেশ ভাল কথা, কিন্তু বুঝিতে হইবে সেগুলি আমাদের পক্ষে আমাদের সমাজে প্রচলিত কতকগুলি কথার কথা—আমরা তোতা পাখীর মত সেগুলি শিখিয়াছি আর মধ্যে মধ্যে আওড়াইয়া থাকি মাত্র। অতএব আমরা যে অবস্থায় ও অধিকারে অবস্থিত, আমাদের সেই অবস্থা ও অধিকার—অর্থাৎ আমরা যে এক্ষণে জড়বাদী—এইটি বুঝিতে হইবে—সুতরাং আমাদিগকে জড়ের সাহায্য অবশ্যই লইতে হইবে। এইরূপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমরা প্রকৃত আত্মবাদী হইব—আপনাদিগকে আত্মা বলিয়া বুঝিব, আত্মা বা চৈতন্য যে কি বস্তু তাহা বুঝিব আর তখন দেখিব—এই যে জগৎকে আমরা অনন্ত বলিয়া থাকি, তাহা ইহার অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষ্ম জগতের একটি স্থূল বাহ্যরূপ মাত্র।

কিন্তু ইহা ব্যতীত আমাদের আরো কিছু প্রয়োজন। আপনারা বাইবেলে যীশুখ্রীষ্টের শৈলোপদেশে (Sermon on the Mount) পাঠ করিয়াছেন, "চাও, তবেই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে ; ঘা দাও, তবেই খুলিয়া দেওয়া হইবে ; খোঁজ, তবেই তোমরা পাইবে।" মুশকিল এইটুকু যে, চায় কে, খোঁজে কে? আমরা সকলেই বলি, আমরা ঈশ্বরকে জানিয়া বসিয়া আছি। একজন ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য এক বৃহৎ পুস্তক লিখিলেন, আর একজন তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মস্ত একখানি বই লিখিলেন। একজন সারা জীবন তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করাই নিজের কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন—অপরে

তীব্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন

তাঁহার অস্তিত্ব খণ্ডন করাই নিজ কর্ত্তব্য মনে করেন আর তিনি মানব জাতিকে এই উপদেশ দিয়া বেড়ান যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। কিন্তু আমি বলি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ লিখিবার কি প্রয়োজন? ঈশ্বর থাকুন বা না-ই থাকুন, অনেক লোকের পক্ষেই তাহাতে কি আসে যায়? এই শহরে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রাতরাশ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন—ঈশ্বর আসিয়া তাঁহার পোষাক পরিবার বা আহারের কোন সাহায্য করেন না। তারপর তিনি কাজে যান ও সারাদিন কাজ করিয়া টাকা রোজগার করেন। ঐ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া তিনি বাড়ী আসেন, তারপর উত্তমরূপে ভোজন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন—এ সকল কার্য্যই তিনি যন্ত্রবৎ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন—ঈশ্বরের চিন্তা মোটেই করেন না—ঈশ্বরের জন্য তাঁহার কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। তাঁহার চারিটি নিত্য কর্ত্তব্য আছে—আহার, পান, নিদ্রা ও বংশবৃদ্ধি। তারপর একদিন শমন আসিয়া বলেন, "সময় হইয়াছে—চল।" তখন সেই ব্যক্তি বলিয়া থাকে—"মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন—আমি আর একটু সময় চাই—আমার ছেলে হরিষটি আর একটু বড় হোক।" কিন্তু শমন বলেন—"এখনই চল—এখনই দেহ ছাড়িতে হইবে।" এইরূপেই জগৎ চলিতেছে। এইরূপে হরিষের বাপ বেচারা সংসারে ফিরিতেছে। আমরা আর সে বেচারাকে কি বলিব—সে ঈশ্বরকে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব বলিয়া বুঝিবার কোন সুযোগ পায় নাই। হয়ত পূর্ব্বজন্মে সে একটি শূকর ছিল—মানুষ হইয়া তদপেক্ষা সে

সাধারণ লোকের সংসারের অতীত বস্তুতে কোন প্রয়োজনবোধ নাই

অনেক ভাল হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় জগৎ ত আর 'হরিষের বাপ' নয়—কতক কতক লোক আছেন যাঁহারা একটু আধটু চৈতন্য লাভ করিয়াছেন। হয়ত একটা কষ্ট আসিল—একজন ব্যক্তি, যাহাকে সে খুব ভালবাসে, সে মরিয়া গেল। যাহার উপর সে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, যাহার জন্য সে সমুদয় জগৎকে, এমন কি নিজের ভাইকে পর্য্যন্ত ঠকাইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, যাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার ভয়ানক কার্য্য করিয়াছে, সে মরিয়া গেল—তখন তাহার হৃদয়ে একটা ঘা লাগিল। হয়ত সে তাহার অন্তরাত্মার এক বাণী শুনিল 'তারপর কি'? যে ছেলের জন্য সে সকলের সহিত প্রতারণা করিতে নিযুক্ত ছিল এবং নিজেও কখনও ভাল করিয়া খায় নাই, সে হয়ত মারা গেল—তখন ঘা খাইয়া তাহার চৈতন্য হইল। যে স্ত্রীকে লাভ করিবার জন্য সে উন্মত্ত বৃষভের ন্যায় সকলের সহিত বিবাদ করিতেছিল, যাহার নূতন নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কারের জন্য সে টাকা জমাইতেছিল, সে একদিন হঠাৎ মরিয়া গেল—তখন তাহার মনে স্বভাবতঃই উদয় হইল—তারপর কি? কাহারও কাহারও অবশ্য মরণ দেখিয়াও মনে কোন আঘাত লাগে না, কিন্তু খুব অল্পস্থলেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই যখন কোন জিনিস আমাদের আঙ্গুল গলিয়া চলিয়া যায়, আমরা বলিয়া থাকি, তাইত, হল কি। আমরা এইরূপ ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত! আপনারা শুনিয়াছেন—জনৈক ব্যক্তি জলে ডুবিতেছিল—সে সম্মুখে আর কিছু না পাইয়া একটা খড় ধরিয়াছিল। সাধারণ মানুষও প্রথমে ঐরূপে খড়ের ন্যায় যাহাকে তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে

কাহারও কাহারও কষ্টে পড়িয়া চৈতন্য হয়

ভালবাসিয়া থাকে আর যখন তাহা দ্বারা কোন কাজ হইবার সম্ভাবনা দেখে না, তখনই বলিয়া থাকে, হে ভগবান্, আমায় রক্ষা কর। তথাপি উচ্চতর অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে মানুষকে অনেক 'আমড়ার অম্বল' খাইতে হয়।

কিন্তু এই ভক্তিযোগ একটা ধর্ম্ম। আর ধর্ম্ম বহুর জন্য নহে; তাহা হওয়াই অসম্ভব। হাত যোড় করা, ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়া, হাঁটু গাড়িয়া বসা, ওঠ বস করা—এ সব কসরত সর্ব্বসাধারণের জন্য হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম অতি অল্প লোকের জন্য। সকল দেশেই হয়ত দুই চারি শত লোকের যথার্থ ধর্ম্ম করিবার অধিকার আছে।

খুব কম লোকেই ভক্ত হইতে পারে

অপরে ধর্ম্ম করিতে পারে না, কারণ, তাহারা অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে না—তাহারা ধর্ম্ম চায়ই না। প্রধান কথা হইতেছে ভগবান্‌কে চাওয়া। আমরা ভগবান ছাড়া আর সব জিনিস চাহিয়া থাকি; কারণ, আমাদের সাধারণ অভাবসমূহ বাহ্য জগৎ হইতেই পূর্ণ হইয়া থাকে। কেবল যখন বাহ্য জগৎ দ্বারা আমাদের অভাব কোনমতে পূর্ণ না হয়, তখনই আমরা অন্তর্জ্জগৎ হইতে—ঈশ্বর হইতে—আমাদের অভাব পূরণার্থ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। যত দিন আমাদের প্রয়োজন এই জড় জগতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন আমাদের ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কেবল যখনই আমরা এখানকার সমুদয় বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই এবং এতদতিরিক্ত কিছু চাহিয়া থাকি, তখনই আমরা ঐ অভাব পূরণের জন্য জগতের বহির্দ্দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। কেবল যখনই আমাদের প্রয়োজন হয়, তখনই তাহার জন্য জোর

তলব হইয়া থাকে। যত শীঘ্র পারেন, এই সংসারের ছেলেখেলা সারিয়া ফেলুন—তখনই এই জগদতীত কিছু প্রয়োজন বোধ করিবেন—তখনই ধর্ম্মের প্রথম সোপান আরম্ভ হইবে।

এক রকম ধর্ম্ম আছে—উহা ফ্যাশান বলিয়াই প্রচলিত। আমার বন্ধুর বৈঠকখানায় হয়ত যথেষ্ট আসবাব আছে—এখনকার ফ্যাশান—একটি জাপানী পাত্র (Vase) রাখা—অতএব হাজার টাকা দাম হইলেও আমার উহা অবশ্যই চাই। এইরূপ আমাদের অল্পস্বল্প ধর্ম্মও চাই ;—একটা সম্প্রদায়েও যোগ দেওয়া চাই। ভক্তি এরূপ লোকের জন্য নহে। ইহাকে প্রকৃত 'ব্যাকুলতা' বলে না। ব্যাকুলতা তাহাকে বলে, যাহা ব্যতীত মানুষ বাঁচিতেই পারে না। আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য বায়ু চাই, খাদ্য চাই, কাপড় চাই, এগুলি ব্যতীত আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না। পুরুষ যখন কোন স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হয়, তখন সময়ে সময়ে সে এরূপ বোধ করে যে, তাহাকে ছাড়িয়া সে ক্ষণমাত্র বাঁচিবে না, যদিও ভ্রম-বশতঃই সে এরূপ ভাবিয়া থাকে। স্বামী মরিলে স্ত্রীরও কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়, সে স্বামীকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারিবে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ত বাঁচিয়াই থাকে দেখা যায়। আমার আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে অনেক সময় আমিও ভাবিয়াছি, আমি আর বাঁচিব না, কিন্তু তবুও ত আমি বাঁচিয়া আছি, প্রকৃত প্রয়োজনের ইহাই রহস্য—তাহাকেই আমাদের যথার্থ প্রয়োজন বা অভাব বলা যায়, যাহা ব্যতীত আমরা বাঁচিতেই পারি না ; হয় আমাদের উহা পাইতে হইবে, নতুবা আমরা মরিব। যখন এমন

ফ্যাশানের ধর্ম্ম করিলে চলিবে না—প্রকৃত প্রয়োজন-বোধ চাই

সময় আসিবে যে, আমরা ভগবানেরও ঐরূপ প্রয়োজন বা অভাব বোধ করিব, অন্য কথায়, যখন আমরা এই জগতের—সমুদয় জড়শক্তির অতীত কিছুর অভাব বোধ করিব, তখন আমরা ভক্ত হইতে পারিব। যখন আমাদের হৃদয়াকাশ হইতে ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞানমেঘ সরিয়া যায়, আমরা সেই সর্ব্বাতীত সত্তার একবার চকিত দর্শন লাভ করি, এবং সেই মুহূর্ত্তের জন্য সকল নীচ বাসনা যেন সিন্ধুতে বিন্দুর ন্যায় ডুবিয়া যায়, তখন আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের সংবাদ কে রাখে? তখনই আত্মার বিকাশ হয়, যে ভগবানের অভাব বোধ করে—তখন সে এমন বোধ করে যে, তাঁহাকে না পাইলেই আর চলিবে না। সুতরাং ভক্ত হইবার প্রথম সোপান এই দিবারাত্র বিচার করা—আমরা কি চাই। প্রত্যহ নিজ মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে—আমরা কি ঈশ্বরকে চাই? আপনারা জগতের সব গ্রন্থ পড়িতে পারেন, কিন্তু বক্তৃতাশক্তি দ্বারা বা উচ্চতম মেধাশক্তি দ্বারা বা নানাবিধ বিজ্ঞান অধ্যয়নের দ্বারা এই প্রেম লাভ করা যায় না। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করে। তাহার নিকটই ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন। * একজন ভালবাসিলে অপরকেও ভালবাসিতে হইবে। আমি আপনাকে ভালবাসিলে আপনাকেও আমাকে ভালবাসিতেই হইবে। আপনি আমাকে ঘৃণা করিতে পারেন আর আপনাকে আমি ভালবাসিতে যাইলে আপনি আমাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইতে পারেন। কিন্তু যদি আমি তাহাতে আপনাকে ভালবাসিতে বিরত না হইয়া আপনাকে ভালবাসিয়াই যাই, তবে আপনাকে আমায় এক মাসে

* কঠোপনিষৎ, প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় বল্লী, ২৩ শ্লোক।

হউক, এক বৎসরে হউক অবশ্যই ভালবাসিতে হইবে। মানসিক জগতের ইহা একটি চিরপরিচিত ঘটনা। ভগবান্ যাহাকে ভালবাসেন, সেও ভগবান্‌কে ভালবাসিয়া থাকে, সে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। যেমন প্রেমিকা স্ত্রী তাহার মৃত পতির উদ্দেশে চিন্তা করে, পুত্রকে আমরা যেরূপভাবে ভালবাসিয়া থাকি, ঠিক সেই ভাবে আমাদিগকে ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে। তবেই আমরা ভগবানকে লাভ করিব—আর এই সব বই, এই সব বিজ্ঞান—আমাদিগকে কিছুই শিখাইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি প্রেমের এক অক্ষর পাঠ করিয়াছে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত। অতএব আমাদিগকে প্রথমে এই ব্যাকুলতাসম্পন্ন হইতে হইবে। প্রত্যহ নিজের মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে, আমরা কি ভগবানকে বাস্তবিক চাই। যখন আমরা ধর্ম্মের সম্বন্ধে কথা কহিয়া থাকি, বিশেষতঃ যখন আমরা উচ্চাসনে বসিয়া অপরকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করি, তখন আপনার মনকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমি অনেক সময় দেখিতে পাই, আমি ভগবান চাই না, বরং তদপেক্ষা খাবার ভালবাসি। এক টুকরা রুটি না পাইলে আমি পাগল হইয়া যাইতে পারি—অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলারা একটা হীরার পিন না পাইলে পাগল হইয়া যাইবেন। তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে একমাত্র সত্য বস্তু রহিয়াছেন, তাঁহাকে জানেন না। আমাদের চলিত কথায় বলে—

মারি ত গণ্ডার।
লুটি ত ভাণ্ডার॥

গ্রন্থাদি পাঠে ভগবান লাভ হয় না, তীব্র ব্যাকুলতা দ্বারাই ভগবান লাভ হয়

গরীবের ঘর লুট করিয়া অথবা পিঁপড়ে মারিয়া কি হইবে? অতএব যদি ভালবাসিতে চান, ভগবান্‌কে ভালবাসুন। সংসারের এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসকে ভালবাসিয়া কি হইবে? আমি স্পষ্টবাদী মানুষ—তবে এ সব কথা আপনাদের ভালর জন্যই বলিতেছি—আমি সত্য কথা বলিতে চাই—আমি তোষামোদ করিতে চাহি না—আমার তা কাজ নয়। তা যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে আমি শহরের ভাল জায়গায় সৌখিন লোকের উপযোগী একটা চার্চ্চ খুলিয়া বসিতাম। আপনারা আমার ছেলের মত—আমি আপনাদিগকে সত্য কথা বলিতে চাই, এই জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা, জগতের সমুদয় শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণই তাহা অনুভব দ্বারা জানিয়া বলিয়া গিয়াছেন। আর ঈশ্বর ব্যতীত এই সংসার পারের আর উপায় নাই। তিনি আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। এই জগৎ যে জীবনের চরম লক্ষ্য—এইরূপ ধারণা ঘোর অনিষ্টকর। এই জগৎ, এই দেহ—সেই চরম লক্ষ্য লাভের উপায়স্বরূপ হইতে পারে এবং উহাদের গৌণ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু এই জগৎ যেন আমাদের চরম লক্ষ্য না হয়। দুঃখের বিষয়, আমরা অনেক সময় এই জগৎকেই উদ্দেশ্য করিয়া ঈশ্বরকে ঐ সংসার-সুখলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই, লোকে মন্দিরে গিয়া ভগবানের নিকট রোগমুক্তি ও অন্যান্য নানাপ্রকার কাম্যবস্তু প্রার্থনা করিতেছে। তাহারা সুন্দর সুস্থ দেহ চায়, আর যেহেতু তাহারা শুনিয়াছে যে, কোন একজন পুরুষ কোন স্থানে বসিয়া আছেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহাদের ঐ

ছোট খাটো জিনিসকে ভাল না বাসিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে

কামনা পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, সেই হেতু তাহারা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। ধর্ম্মের এইরূপ ধারণা অপেক্ষা নাস্তিক হওয়া ভাল। আমি আপনাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ভক্তিই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। লক্ষ লক্ষ বৎসরে আমরা এই আদর্শ অবস্থায় উপনীত হইতে পারি কি না জানি না, কিন্তু ইহাকেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ করিতে হইবে—আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে উচ্চতম বস্তু লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করিতে হইবে। যদি একেবারে শেষ প্রান্তে পঁহুছান না যায়, অন্ততঃ কিছুদূর পর্য্যন্ত ত যাওয়া যাইবে। আমাদিগকে ধীরে ধীরে এই জগৎ ও ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া ঈশ্বরের নিকট পঁহুছিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্ম্মাচার্য্য—সিদ্ধগুরু ও অবতারগণ

কর্ম্মবাদ সত্য হইলেও গুরুকরণ অত্যাবশ্যক

সকল আত্মাই বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে—চরমে সকল প্রাণীই সেই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আমরা অতীতকালে যেরূপভাবে জীবন যাপন করিয়াছি অথবা যেরূপ চিন্তা করিয়াছি, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার ফলস্বরূপ, আর এক্ষণে যেরূপ কার্য্য বা চিন্তা করিতেছি, তদনুসারে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইবে। এই কঠোর কর্ম্মবাদ সত্য হইলেও ইহার এই মর্ম্ম নহে যে, আত্মোন্নতি সাধনে মদতিরিক্ত অপর কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না। আত্মার মধ্যে যে শক্তি অব্যক্তভাবে রহিয়াছে, সকল সময়েই অপর আত্মার শক্তিসঞ্চারেই তাহা জাগ্রত হইয়া থাকে। এ কথা সত্য যে, অধিকাংশক্ষেত্রে এরূপ অপরের সহায়তা না হইলে চলিতে পারে না বলিলেই হয়। বাহির হইতে শক্তি আসিয়া আমাদের আত্মাভ্যন্তরস্থ গূঢ়ভাবে অবস্থিত শক্তির উপর কার্য্য করিতে থাকে। তখনই আত্মোন্নতির সূত্রপাত হয়, মানবের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়, চরমে মানব পরমশুদ্ধ ও পূর্ণ হইয়া যায়।

বাহির হইতে যে শক্তি আসার কথা বলা হইল, উহা গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক আত্মা অপর 'আত্মা হইতেই শক্তি

প্রাপ্ত হইতে পারে, অপর কোথাও হইতে নহে। আমরা সারা জীবন বই পড়িতে পারি, আমরা খুব বুদ্ধিজীবী হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু পরিণামে দেখিবে, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুমাত্র হয় নাই। বুদ্ধির খুব উচ্চবিকাশ হইলেও যে সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই; বরং আমরা প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, বুদ্ধির যতটা উন্নতি হইয়াছে, আত্মার সেই পরিমাণ অবনতি ঘটিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে গেলে গ্রন্থ হইতে কিছুই সাহায্য পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন কখন আমরা ভ্রমবশতঃ মনে করি আমরা উহা হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তা পাইতেছি, কিন্তু যদি বিশেষরূপে আমাদের অন্তর বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে বুঝিব, উহাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির কিঞ্চিৎ সহায়তা হইয়াছে মাত্র, আত্মোন্নতির সহায়তা কিছুমাত্র হয় নাই। আমরা প্রায় সকলেই যে ধর্ম্মসম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারি, অথচ ধর্ম্মানুযায়ী জীবন যাপনের সময় আপনাদিগকে ঘোরতর অসমর্থ দেখিতে পাই, ইহাই তাহার কারণ। সেই কারণ এই যে, বাহির হইতে যে শক্তি সঞ্চারিত হইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মজীবনযাপনে সমর্থ করে, শাস্ত্র হইতে তাহা পাওয়া যায় না। আত্মাকে জাগ্রত করিতে হইলে অপর আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

গ্রন্থ হইতে আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ অসম্ভব

যে আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে গুরু এবং যাহাতে

সঞ্চারিত হয়, তাহাকে শিষ্য বলে। এই শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ, যাহা হইতে শক্তি আসিবে, তাঁহার সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক ; দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাহার উহা গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সজীব হওয়া আবশ্যক, ক্ষেত্রও সুকৃষ্ট হওয়া চাই, আর যথায় এই দুইটিই বর্ত্তমান, তথায়ই ধর্ম্মের অত্যদ্ভুত বিকাশ হইয়া থাকে। 'আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা'—ধর্ম্মের বক্তাও অলৌকিক গুণ-সম্পন্ন হওয়া চাই, আর শ্রোতারও তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন। আর যখন প্রকৃতপক্ষে উভয়েই অলৌকিক গুণসম্পন্ন অসাধারণ প্রকৃতির হয়, তখনই অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখা যাইবে—নতুবা নহে। এইরূপ লোকই যথার্থ গুরু আর এইরূপ লোকই যথার্থ শিষ্য —অপরে ধর্ম্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে মাত্র। তাহাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটু জানিবার চেষ্টা, একটু সামান্য কৌতূহল হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু তাহারা এখনও ধর্ম্মের গণ্ডির বহিঃসীমায় দাঁড়াইয়া আছে। অবশ্য ইহারও কিছু মূল্য আছে। সময়ে সবই হইয়া থাকে। কালে এই সকল ব্যক্তির হৃদয়েই যথার্থ ধর্ম্মপিপাসা জাগ্রত হইতে পারে। আর প্রকৃতির ইহা অতি রহস্যময় নিয়ম যে, ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই বীজ আসিবেই আসিবে, জীবাত্মার যখনই ধর্ম্মের প্রয়োজন হইবে, তখনই ধর্ম্মশক্তিসঞ্চারক অবশ্যই আসিবেন। কথায় বলে "যে পাপী পরিত্রাতাকে খুঁজিতেছে, পরিত্রাতাও খুঁজিয়া গিয়া সেই পাপীকে উদ্ধার করেন।" গ্রহীতার আত্মার ধর্ম্ম-আকর্ষণীশক্তি যখন পূর্ণ ও পরিপক্ব হয়, তখন উহা যে শক্তিকে খুঁজিতেছে, তাহা অবশ্য আসিবে।

গুরু ও শিষ্য

তবে পথে কতকগুলি বিঘ্ন আছে। গ্রহীতার সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসকে যথার্থ ধর্ম্মপিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। আমরা অনেক সময় আমাদের জীবনে ইহা দেখিতে পাই। আমরা কোন ব্যক্তিকে ভালবাসিতাম—সে মরিয়া গেল—আমরা মুহূর্ত্তের জন্য আঘাত পাইলাম। আমরা মনে করিলাম—সমুদয় জগৎটা জলের মত আমাদের অঙ্গুলি গলিয়া পলাইতেছে। তখন আমরা ভাবি—এই অনিত্য সংসার লইয়া আর কি হইবে, সংসার হইতে শ্রেষ্ঠ সারবস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইবে—ধার্ম্মিক হইতে হইবে। কিছুদিন বাদে আমাদের মন হইতে সেই ভাবতরঙ্গ চলিয়া গেল—আমরা যেখানে ছিলাম, সেইখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা অনেক সময় এইরূপ সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসকে যথার্থ ধর্ম্মপিপাসা বলিয়া ভ্রমে পতিত হই, কিন্তু যতদিন আমরা এইরূপ ভুল করিব, ততদিন সেই অহরহব্যাপী, প্রকৃত প্রয়োজন বোধ আসিবে না—আর আমরা শক্তিসঞ্চারকেরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিব না।

শিষ্য যেন ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা বলিয়া ভ্রম না করেন

অতএব যখন আমরা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলি যে, আমরা সত্যলাভের জন্য এত ব্যাকুল অথচ উহা লাভ হইতেছে না—তখন ঐরূপ বিরক্তি প্রকাশের পরিবর্ত্তে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য—নিজ নিজ অন্তরাত্মায় অনুসন্ধান করিয়া দেখা—আমরা যথার্থই ধর্ম্ম চাই কি না। তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলেই দেখিব—আমরাই ধর্ম্মলাভের উপযুক্ত নহি—আমাদের ধর্ম্মের এখনও প্রয়োজন হয়

নাই; অধ্যাত্মতত্ত্বলাভের জন্য এখনও পিপাসা জাগে নাই। শক্তিসঞ্চারকের সম্বন্ধে আরও অধিক গোল।

এমন অনেক লোক আছে, তাহারা যদিও স্বয়ং অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন তথাপি অহঙ্কার বশতঃ আপনাদিগকে সবজান্তা মনে করে— আর শুধু তাহাই মনে করিয়া ক্ষান্ত হয় না, তাহারা অপরকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে চায়। এইরূপে অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় উভয়েই খানায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া থাকে। জগৎ এইরূপ জনগণে পূর্ণ। সকলেই গুরু হইতে চায়। এ যেন ভিখারীর লক্ষ মুদ্রা দানের প্রস্তাবের ন্যায়। যেমন এই ভিক্ষুকেরা হাস্যাস্পদ হয়, এই গুরুরাও তদ্রূপ।

জ্ঞানাভিমানী অথচ অজ্ঞ গুরুগণ হইতে সাবধান

তবে গুরুকে চিনিব কিরূপে? প্রথমতঃ সূর্য্যকে দেখিবার জন্য মশালের বা বাতির প্রয়োজন হয় না। সূর্য্য উঠিলেই আমরা স্বভাবতঃই জানিতে পারি যে, উহা উঠিয়াছে, আর যখন আমাদের কল্যাণার্থে কোন লোকগুরুর অভ্যুদয় হয়, তখন আত্মা স্বভাবতঃই জানিতে পারে যে, সে সত্যবস্তুর সাক্ষাৎকার পাইয়াছে। সত্য স্বতঃসিদ্ধ—উহার সত্যতা সিদ্ধ করিবার জন্য অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হয় না—উহা স্বপ্রকাশ, উহা আমাদের প্রকৃতির অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করে আর সমগ্র প্রকৃতি—সমগ্র জগৎ—উহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে।

প্রকৃত গুরুকে আপনিই চেনা যায়

অবশ্য এ কথাগুলি অতি শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য,

কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত নীচু থাকের আচার্য্যগণের নিকটও সাহায্য পাইতে পারি। আর যেহেতু আমারাও সকল সময়ে এতাদৃশ অন্তর্দ্দৃষ্টিসম্পন্ন নহি যে, আমরা যাঁহার নিকট হইতে শক্তিলাভের জন্য যাইতেছি, তাঁহার সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারিব—সেই হেতু উভয়েরই কতকগুলি লক্ষণ জানা আবশ্যক। শিষ্যের কতকগুলি গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক—গুরুরও তদ্রূপ।

সাধারণতঃ কিন্তু গুরু-শিষ্যের কতক-গুলি লক্ষণ জানা আবশ্যক

শিষ্যের নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা আবশ্যক—পবিত্রতা, যথার্থ জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যবসায়। অপবিত্র ব্যক্তি কখনও ধার্ম্মিক হইতে পারে না। ইহাই শিষ্যের পক্ষে একটি প্রধান প্রয়োজনীয় গুণ। সর্ব্বপ্রকারে পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রয়োজন—যথার্থ জ্ঞানপিপাসা। জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্ম চায় কে? সনাতন বিধানই এই যে, আমরা যাহা চাহিব তাহাই পাইব। যে চায়—সে পায়। ধর্ম্মের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিস—আমরা সাধারণতঃ উহাকে যত সহজ মনে করি, উহা তত সহজ নহে। তারপর আমরা ত সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই যে, ধর্ম্মের কথা শুনিলেই বা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িলেই ধর্ম্ম হয় না—যত দিন না সম্পূর্ণ জয়লাভ হইতেছে, ততদিন অবিশ্রান্ত চেষ্টা, নিজ প্রকৃতির সহিত অবিরাম সংগ্রামই ধর্ম্ম। এ দুএক দিনের বা কয়েক বৎসর বা কয়েক জন্মেরও কথা নয়—হইতে পারে প্রকৃত ধর্ম্মলাভ করিতে শত শত জন্ম লাগিবে। ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। এই মুহূর্ত্তেই

শিষ্যের লক্ষণ

উহা আমাদের লাভ হইতে পারে অথবা শত শত জন্মেও লাভ না হইতে পারে—তথাপি আমাদিগকে উহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে শিষ্য এইরূপ হৃদয়ের ভাব লইয়া ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হয়, সে-ই কৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

গুরুর লক্ষণ

গুরুর সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে, যেন তিনি শাস্ত্রের মর্ম্মাভিজ্ঞ হন। সমগ্র জগৎ বেদ, বাইবেল, কোরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে—কিন্তু ওগুলি ত কেবল শব্দ মাত্র—ধর্ম্মের শুক্‌নো হাড় কয়েকখানা মাত্র—লট্ লোট্ লঙ—কৃৎ তদ্ধিত ডুকৃঞ্-করণে। গুরু হয়ত কোন গ্রন্থবিশেষের সময় নিরূপণে সমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু শব্দ ত ভাবের বাহ্য আকৃতি বই আর কিছুই নহে। যাহারা শব্দ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করে এবং মনকে সর্ব্বদা শব্দের শক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হইতে দেয়, তাহারা ভাব হারাইয়া ফেলে। অতএব গুরুর পক্ষে শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। শব্দজাল মহা অরণ্যস্বরূপ—চিত্তভ্রমণের কারণ—মন ঐ শব্দজালের মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বাহিরে যাইবার পথ দেখিতে পায় না।* বিভিন্ন প্রকারে শব্দযোজনার কৌশল, সুন্দর ভাষা কহিবার বিভিন্ন উপায়, শাস্ত্রের ব্যাখা করিবার নানা উপায়, কেবল পণ্ডিতদের ভোগের জন্য—তাহাতে কখনও মুক্তিলাভ হয় না।+ তাহারা কেবল নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্য উৎসুক—যাহাতে জগৎ তাহাদিগকে খুব

* শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণং—বিবেকচূড়ামণি।

+ বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলং।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥—বিবেকচূড়ামণি।

পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করে। আপনারা দেখিবেন, জগতের কোন শ্রেষ্ঠ আচার্য্যই এইরূপ শাস্ত্রের শ্লোকের বিবিধ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা বলেন নাই, এই শব্দের এই অর্থ আর এই শব্দ আর ঐ শব্দের এইরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি। আপনারা জগতের সমুদয় শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণেরই চরিত্র পাঠ করিয়াছেন। দেখিয়াছেন ত—তাঁহাদের মধ্যে কেহই ঐরূপ করেন নাই। তথাপি তাঁহারাই যথার্থ শিক্ষা দিয়াছেন। আর যাঁহাদের কিছুই শিখাইবার নাই, তাঁহারা একটি শব্দ লইয়া সেই শব্দের কোথা হইতে উৎপত্তি, কোন্ ব্যক্তি উহা প্রথম ব্যবহার করে, সে কি খাইত, কিরূপে ঘুমাইত, এই সম্বন্ধে এক তিন-খণ্ড গ্রন্থ লিখিলেন।

গুরু যেন শাস্ত্রের শব্দমাত্রবিৎ না হইয়া মর্ম্মাভিজ্ঞ হন

মদীয় আচার্য্যদেব এক গল্প বলিতেন—"এক বাগানে দুজন লোক বেড়াতে গিছলো; তার ভেতর যার বিষয়বুদ্ধি বেশী, সে বাগানে ঢুকেই কটা আমগাছ, কোন্ গাছে কত আম হয়েছে, এক একটা ডালে কত পাতা, বাগানটির কত দাম হতে পারে, ইত্যাদি নানারকম বিচার কর্‌তে লাগলো। আর একজন বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করে গাছতলায় বোসে একটি কোরে আম পাড়তে লাগলো আর খেতে লাগলো। বল দেখি, কে বুদ্ধিমান্? আম খাও, পেট ভরবে; কেবল পাতা গুণে হিসাব কিতাব কোরে লাভ কি?" অবশ্য হিসাব কিতাবেরও ক্ষেত্রবিশেষে উপযোগিতা আছে বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে নহে। ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তি কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না—

এই সব 'পাতাগোণা' দলের ভিতর কি আপনারা কখন ধর্ম্মবীর দেখিয়াছেন? ধর্ম্মই মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, উহাই মানব-জীবনের সর্ব্বোচ্চ গৌরব; কিন্তু উহা আবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ—উহাতে পাতাগোণা—হিসাব কিতাব করা প্রভৃতিরূপ মাথা-বকানোর কোন প্রয়োজন হয় না। যদি আপনি খ্রীষ্টান হইতে চান, তবে কোথায় খ্রীষ্টের জন্ম হয়,—বেথলিহেমে বা জেরুজালেমে—তিনি কি করিতেন, অথবা ঠিক কোন তারিখে 'শৈলোপদেশ' (Sermon on the Mount) দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি যদি কেবল ঐ উপদেশ প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তবেই যথেষ্ট। কখন্ ঐ উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে দুই শত কথা পড়িবার আপনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ সব পণ্ডিতদের আমোদের জন্য—তাঁহারা উহা লইয়া আনন্দ করুন। তাঁহাদের কথায় 'শান্তিঃ' 'শান্তিঃ' বলিয়া আমরা আম খাই আসুন।

দ্বিতীয়তঃ গুরুর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ডে জনৈক বন্ধু একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "গুরুর ব্যক্তিগত চরিত্র—তিনি কি করেন না করেন, দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যাহা বলেন, সেইটি লইয়া কার্য্য করিলেই হইল।" এ কথা ঠিক নয়। যদি কোন ব্যক্তি আমাকে গতিবিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্য কোন জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু শিখাইতে ইচ্ছা করে, সে যে চরিত্রের লোক হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই—সে অনায়াসে উহা শিক্ষা দিতে পারে। ইহা সম্পূর্ণ সত্য—কারণ জড়বিজ্ঞান শিখাইতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিসম্বন্ধীয় বলিয়া

দ্বিতীয়তঃ—গুরু যেন পূত-চরিত হন

বুদ্ধিবৃত্তির তেজের উপর নির্ভর করে—এরূপ ক্ষেত্রে আত্মার বিকাশ কিছুমাত্র না থাকিলেও সে একজন প্রকাণ্ড বুদ্ধিজীবী হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মবিজ্ঞানের কথা স্বতন্ত্র—যে ব্যক্তি অশুদ্ধ-চিত্ত, সেই আত্মায় যে কোনরূপ ধর্ম্মালোক প্রতিভাত হইতে পারে তাহা অসম্ভব। তাঁহার নিজেরই যদি কোন রূপ ধর্ম্মভাব না রহিল, তবে তিনি কি শিক্ষা দিবেন? তিনি ত নিজেই কিছু জানেন না। চিত্তের পরমশুদ্ধিই একমাত্র আধ্যাত্মিক সত্য। "পবিত্রাত্মারা ধন্য—কারণ, তাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিবেন"। এই এক বাক্যের মধ্যেই ধর্ম্মের সমুদয় সারতত্ত্ব নিহিত। যদি আপনি এই একটি কথা শিখিয়া থাকেন তবে অতীতকালে ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবার সম্ভাবনা, তাহা আপনি জানিয়াছেন। আপনার আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন নাই—কারণ, আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন, ঐ এক বাক্যের মধ্যে সমুদয় নিহিত রহিয়াছে। সমুদয় শাস্ত্র নষ্ট হইয়া গেলেও ঐ একমাত্র বাক্যই সমগ্র জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। যতক্ষণ না জীবাত্মা শুদ্ধস্বভাব হইতেছেন, ততক্ষণ ঈশ্বরদর্শন বা সেই সর্ব্বাতীত তত্ত্বের চকিত দর্শনও অসম্ভব। অতএব ধর্ম্মাচার্য্যের পক্ষে শুদ্ধচিত্ততারূপ গুণ অবশ্যই আবশ্যক। প্রথমে আমাদিগকে দেখিতে হইবে—তিনি কি চরিত্রের লোক, তারপর তিনি কি বলেন, তাহা শুনিতে হইবে। লৌকিক বিদ্যার আচার্য্যগণের সম্বন্ধে অবশ্য ওকথা খাটে না। তাঁহারা কি চরিত্রের লোক, ইহা জানা অপেক্ষা তাঁহারা কি বলেন, এইটি জানা আমাদের অগ্রে প্রয়োজন। ধর্ম্মাচার্য্যের পক্ষে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমেই তিনি কিরূপ চরিত্রের লোক দেখিতে

হইবে—তবেই তাহার কথার একটা মূল্য হইবে—কারণ, তিনি শক্তি-সঞ্চারক। যদি তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকে, তবে তিনি কি সঞ্চার করিবেন? একটি উপমা দেওয়া যাইতেছে। যদি এই অগ্ন্যাধারে অগ্নি থাকে, তবেই উহা অপর পদার্থে তাপ সঞ্চার করিতে পারে, নতুবা নহে। ইহা একজন হইতে আর একজনে সঞ্চারের কথা—কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তেজিত করা নহে। গুরুর নিকট হইতে একটা প্রত্যক্ষ কিছু আসিয়া শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করে—উহা প্রথমে বীজস্বরূপে আসিয়া বৃহৎ বৃক্ষাকারে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতএব গুরুর নিষ্পাপ ও অকপট হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, গুরুর উদ্দেশ্য কি, দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে—তিনি যেন নাম, যশ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত না হন। কেবল ভালবাসা—শিষ্যের প্রতি অকপট ভালবাসাই—যেন তাঁহার কার্য্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক হয়। গুরু হইতে শিষ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহা কেবল ভালবাসারূপ মধ্যবর্ত্তীর (Medium) ভিতর দিয়াই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। অপর কোন মধ্যবর্ত্তী দ্বারা উহা সঞ্চার করা যাইতে পারে না। কোনরূপ লাভ বা নাম-যশের আকাঙ্ক্ষারূপ অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তৎক্ষণাৎ ঐ শক্তিসঞ্চারক মধ্যবর্ত্তী বস্তু বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ভালবাসার মধ্য দিয়াই সমুদয় করিতে হইবে। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তিনিই গুরু হইতে পারেন।

তৃতীয়তঃ—শিষ্যের কল্যাণাকাঙ্ক্ষাই যেন গুরুর কার্য্যের প্রবর্ত্তক হয়—নাম যশ বা অন্য কিছু নহে

যখন দেখিবেন, আপনার গুরুর এই সমুদয় গুণগুলি আছে, তখন আপনার আর কোন চিন্তা নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলে তাঁহার নিকট শিক্ষা লওয়ায় বিপদাশঙ্কা আছে। যদি তিনি সদ্ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, সময়ে সময়ে অসদ্ভাব সঞ্চার করিতে পারেন। ইহাই বিশেষ বিপদাশঙ্কা। ইহা হইতে সাবধান হইতে হইবে। অতএব স্বভাবতঃই ইহা বোধ হইতেছে যে, যেখানে সেখানে, যাহার তাহার নিকট হইতে শিক্ষালাভের কোন সম্ভাবনা নাই। নদী ও প্রস্তরাদি হইতে উপদেশ শ্রবণ অলঙ্কারহিসাবে সুন্দর কথা হইতে পারে, কিন্তু নিজের ভিতরে সত্য না থাকিলে কেহ উহার এক কণাও প্রচার করিতে সমর্থ নহে। নদীর উপদেশ শুনিতে পায় কে?—যে জীবাত্মা, যে জীবনপদ্ম পূর্ব্বেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে; কিন্তু গুরুই ঐ পদ্ম প্রস্ফুটিত করিয়া দেন—তাঁহার নিকট হইতেই জীবাত্মা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়। হৃৎপদ্ম একবার প্রস্ফুটিত হইলে তখন নদী বা চন্দ্রসূর্য্যতারকার নিকট শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে—ইহাদের সকলের নিকট হইতেই কিছু না কিছু ধর্ম্মশিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাহার হৃৎপদ্ম এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই, সে তাহাতে শুধু নদী-প্রস্তর-তারকাদি দেখিবে। একজন অন্ধ ব্যক্তি চিত্রশালায় যাইতে পারে, কিন্তু তাহার কেবল যাওয়া আসাই সার; অগ্রে তাহাকে চক্ষুষ্মান্ করিতে হইবে, তবে সে ঐ স্থান হইতে কিছু শিক্ষা পাইবে। গুরুই আধ্যাত্মিক রাজ্যের নয়ন-উন্মীলনকর্ত্তা। অতএব পূর্ব্বপুরুষ ও পরবংশীয়গণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত আমাদের সে সম্বন্ধ।

যথার্থ গুরুশিষ্য সম্বন্ধ না থাকিলে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ অসম্ভব

গুরুই ধর্ম্মরাজ্যের পূর্ব্বপুরুষ এবং শিষ্য তাঁহার আধ্যাত্মিক সন্তান-সন্ততিতুল্য। স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও এতদ্বিধ কথাসমূহ মুখে বলিতে বেশ ভাল শুনায় বটে, কিন্তু নিজ অন্তরে দৃষ্টি করিলে প্রকৃতপক্ষে আমরা স্বাধীন কিনা, বেশ বুঝিতে পারা যায়। নম্রতা, বিনয়, আজ্ঞাবহতা, ভক্তি, বিশ্বাস ব্যতীত কোন প্রকার ধর্ম্ম হইতে পারে না, আর আপনারা এই ব্যাপারটি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, যেখানে গুরুশিষ্যের মধ্যে এতদ্রূপ সম্বন্ধ এখনও বর্ত্তমান, তথায়ই কেবল বড় বড় ধর্ম্মবীর জন্মাইয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা এইরূপ সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহারা ধর্ম্মকে মাত্র বক্তৃতারূপে পরিণত করিয়াছে। গুরু তাঁহার পাঁচটি টাকার প্রত্যাশী, আর শিষ্যও গুরুর বাক্যাবলী দ্বারা মস্তিষ্করূপ পাত্র পূর্ণ করিয়া লইবার আশা করেন—তারপর উভয়েই উভয়ের পথ দেখেন। এই সমস্ত জাতি ও এই সমস্ত চার্চ্চের ভিতর, যেখানে গুরুশিষ্যের মধ্যে—এতদ্রূপ সম্বন্ধ আদৌ নাই, তথায় ধর্ম্মের 'ধও' নাই বলিলেই হয়। গুরুশিষ্যের ভিতর ঐরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে তাহা আসিতেই পারে না। প্রথমতঃ, সঞ্চার করিবারও কেহ নাই, দ্বিতীয়তঃ, এমন কেহ নাই, যাহার ভিতর উহা সঞ্চারিত হইবে—কারণ সকলেই যে স্বাধীন! তাহারা আর শিখিবে কাহার নিকট হইতে? আর যদিই তাহারা শিখিতে আসে, তাহাদের মতলব এই যে, পয়সা দিয়া উহা কিনিবে। আমাকে এক টাকার ধর্ম্ম দাও। আমরা কি আর টাকা খরচ করিতে পারি না? কিন্তু উক্ত উপায়ে ধর্ম্মলাভ হইবার নহে।

এই ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে উচ্চতর ও পবিত্রতর আর কিছু নাই—

উহা মানবাত্মায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। মানব সম্পূর্ণ যোগী হইলেই ঐ জ্ঞান আপনা আপনি আসিয়া থাকে, কিন্তু গ্রন্থ হইতে উহা লাভ করা যায় না! যতদিন না গুরুলাভ করিতেছেন, ততদিন দুনিয়ার চার কোণে মাথা খুঁড়িয়া আসুন, অথবা হিমালয়, আল্পস্ বা ককেসস্ পর্ব্বত অথবা গোবি বা সাহারা মরুভূমিতেই বিচরণ করুন, বা সাগরের অতল তলেই প্রবেশ করুন, কিছুতেই এই জ্ঞান আসিবে না। গুরুলাভ করিয়া—সন্তান যেমন পিতার সেবা করে—তদ্রূপ তাঁহার সেবা করুন—তাঁহার নিকট হৃদয় খুলিয়া দিন—তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া দর্শন করুন। ভগবান্ বলিয়াছেন, "আচার্য্যকে আমি অর্থাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিও।" গুরু আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—এই বলিয়া প্রথম তাঁহার প্রতি চিত্ত সংলগ্ন হয়। তার পর তাঁহার ধ্যান যতই প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর হয়, ততই গুরুর ছবি মিলাইয়া যায়, তাঁহার আকারটা আর দেখা যায় না, তৎস্থলে কেবল যথার্থ ঈশ্বরই বর্ত্তমান থাকেন। যাহারা এইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসার ভাব লইয়া সত্যানুসন্ধানে অগ্রসর হয়, তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান্ অতি অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন। বাইবেলে একস্থানে আছে, "জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ, যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র ভূমি।" যেখানেই তাঁহার নাম উচ্চারিত হয়, সেই স্থানই পবিত্র! যিনি তাঁহার নাম উচ্চারণ করেন, তিনি কতদূর পবিত্র, ভাবুন দেখি। আর যে ব্যক্তির নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ লাভ হয়, কতদূর

গুরুলাভ এবং শ্রদ্ধাভক্তি-পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশা-নুসরণেই সত্যতত্ত্বলাভ—গ্রন্থপাঠে নহে

ভক্তির সহিত তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হওয়া উচিত! এই ভাব লইয়া আমাদিগকে গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। এই জগতে এরূপ গুরু যে সংখ্যায় অতি বিরল, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু জগৎ কোনকালে সম্পূর্ণরূপে এরূপ গুরুশূন্য হয় না। যে মুহূর্ত্তে ইহা সম্পূর্ণরূপে এইরূপ গুরুবিরহিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই ইহা ঘোরতর নরককুণ্ডে পরিণত হইবে, ইহা নষ্ট হইয়া যাইবে। এই গুরুগণই মানবজীবনরূপ বৃক্ষের সুচারু পুষ্পস্বরূপ—তাঁহারা আছেন বলিয়াই জগতের কার্য্য চলিতেছে। এইরূপ জীবন হইতে যে শক্তি প্রসূত হয়, তাহাতেই সমাজবন্ধনকে অব্যাহত রাখিয়াছে।

ইঁহারা ব্যতীত আর এক প্রকার গুরু আছেন—সমগ্র জগতের খ্রীষ্টতুল্য ব্যক্তিগণ। তাঁহারা সকল গুরুর গুরু—স্বয়ং ঈশ্বরের মানবরূপে প্রকাশ। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত গুরুগণের অপেক্ষাও

অবতার

শ্রেষ্ঠ! তাঁহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, শুধু ইচ্ছামাত্র অপরের ভিতর ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। তাঁহাদের শক্তিতে অতি হীনতম, অধম-চরিত্র ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিণত হয়। তাঁহারা কিরূপে ইহা করিতেন, তৎসম্বন্ধে কি আপনারা পড়েন নাই? আমি যে সকল গুরুর কথা বলিতেছিলাম, তাঁহারা সেরূপ গুরু নহেন—ইঁহারা কিন্তু সকল গুরুর গুরু—মানুষের নিকট ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। আমরা তাঁহাদের মধ্য দিয়া ব্যতীত ঈশ্বরকে কোনরূপে দেখিতে পাই না। আমরা তাঁহাদিগকে পূজা না করিয়া থাকিতে পারি না এবং কেবল তাঁহাদিগকেই আমরা পূজা করিতে বাধ্য।

অবতারের মধ্য দিয়া তিনি যে ভাবে প্রকাশিত, তাহা ব্যতীত কোন মানব অন্যরূপে ঈশ্বরকে দেখেন নাই। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। যদি আমরা তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করি, তবে আমরা কেবল তাঁহাকে এক ভয়ানক বিকৃতাকার করিয়াই গঠন করিয়া থাকি। আমাদের চলিত কথায় বলে, একটি মূর্খ লোক শিব গড়িতে গিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া একটি বানর গড়িয়াছিল। এইরূপ যখনই আমরা ঈশ্বরের প্রতিমাগঠনে চেষ্টা করি, তখনই আমরা তাঁহাকে বিকৃতাকার করিয়া তুলি, কারণ আমরা যতক্ষণ মানব রহিয়াছি ততক্ষণ আমরা তাঁহাকে মানবাপেক্ষা উচ্চতর আর কিছু ভাবিতে পারি না। অবশ্য এমন সময় আসিবে, যখন আমরা মানবপ্রকৃতি অতিক্রম করিব এবং তাঁহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইব। কিন্তু যতদিন আমরা মানুষ রহিয়াছি, ততদিন আমাদিগকে তাঁহাকে মনুষ্যরূপেই উপাসনা করিতে হইবে। যাহাই বলুন না কেন, যতই চেষ্টা করুন না কেন, ঈশ্বরকে মানব ব্যতীত অন্যরূপে দেখিতে পাইবেন না। আপনারা খুব বড় বড় বুদ্ধিকৌশলপূর্ণ বক্তৃতা করিতে পারেন, খুব দিগ্‌গজ যুক্তিবাদী হইতে পারেন, প্রমাণ করিতে পারেন যে, ঈশ্বরসম্বন্ধে এই যে সকল পৌরাণিক গল্প কথিত হইয়া থাকে, এ সমুদয়ই মিথ্যা, কিন্তু একবার সহজভাবে বিচার করুন দেখি, ঐ অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা কি লইয়া? উহা শূন্য মাত্র—উহা ভূয়া বই আর কিছু নহে—উহাতে সার কিছুই নাই। এখন হইতে যখন দেখিবেন, কোন ব্যক্তি এইরূপে ঈশ্বরপূজার বিরুদ্ধে খুব প্রবল

মানবভাবে ব্যতীত অন্য কোন ভাবে আমাদের ভগবানকে দেখিবার সাধ্য নাই

বুদ্ধিকৌশলপূর্ণ বক্তৃতা করিতেছে, তখন সেই বক্তাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার ঈশ্বরসম্বন্ধে কি ধারণা—সে 'সর্ব্বশক্তিমত্তা', 'সর্ব্বব্যাপিতা', 'সর্ব্বব্যাপী প্রেম' ইত্যাদি শব্দে ঐগুলির বানান ব্যতীত আর অধিক কি বুঝিয়া থাকে। সে কিছুই বোঝে না, সে ঐ শব্দগুলির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোন ভাবই বোঝে না। রাস্তার যে লোকটি একখানিও বই পড়ে নাই, সে তাহা অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। তবে রাস্তার লোকটি নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি—সে জগতের কোনরূপ শান্তিভঙ্গ করে না, কিন্তু অপর ব্যক্তির তর্কের জ্বালায় জগৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। তাহার প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ ধর্ম্মানুভূতি নাই, সুতরাং উভয়েই এক ভূমিতে অবস্থিত। প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম্ম, আর বচন ও প্রত্যক্ষানুভূতির ভিতর বিশেষ প্রভেদ করা উচিত। যাহা আপনি নিজ আত্মাতে অনুভব করেন, তাহাই প্রত্যক্ষানুভূতি। যে ঐরূপ বাক্যব্যয় করে তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, "তোমার সর্ব্বশক্তিমত্তার কি ধারণা? তুমি কি সর্ব্বশক্তিমত্তা বা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে দেখিয়াছ? এই সর্ব্বব্যাপী পুরুষ বলিতে তুমি কি বোঝ? মানুষের ত আত্মার সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই—তাহার সম্মুখে যে কেবল আকৃতিমান্ বস্তু সে দেখে, সেইগুলি দিয়াই তাহাকে আত্মা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। তাহাকে নীল আকাশ বা প্রকাণ্ড বিস্তৃত ময়দান বা সমুদ্র বা অন্য কিছু বৃহৎ বস্তুর চিন্তা করিতে হয়। তাহা না হইলে আর কিরূপে তুমি ঈশ্বর চিন্তা করিবে? তবে তুমি করিতেছ কি? তুমি সর্ব্বব্যাপিতার কথা কহিতেছ, অথচ সমুদ্রের বিষয় ভাবিতেছ। ঈশ্বর কি সমুদ্র? অতএব সংসারের এই সব বৃথা তর্কযুক্তি

দূরে ফেলিয়া দিন—আমরা সাদাসিদে জ্ঞান চাই। আর এই সাদাসিদে জ্ঞান যতদূর দুর্লভ বস্তু, জগতে আর কিছুই তত নহে। জগতে কেবল লম্বা লম্বা কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব দেখা গেল, আমাদের বর্ত্তমান গঠন ও প্রকৃতি যদ্রূপ, তাহাতে আমরা সীমাবদ্ধ এবং আমরা ভগবান্‌কে মানবভাবে দেখিতে বাধ্য। মহিষেরা যদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহারা ঈশ্বরকে এক বৃহৎকায় মহিষরূপে দেখিবে। মৎস্য যদি ভগবানের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে বৃহদাকার মৎস্যরূপে ভগবানের ধারণা করিতে হইবে, মানুষকেও এইরূপ ভগবান্‌কে মানুষরূপেই ভাবিতে হইবে, আর এগুলি কল্পনা নহে। আপনি, আমি, মহিষ, মৎস্য—ইহাদের প্রত্যেকে যেন বিভিন্ন পাত্রস্বরূপ। এগুলি নিজ নিজ আকৃতির পরিমাণে জলে পূর্ণ হইবার জন্য সমুদ্রে গমন করিল। মানবরূপ পাত্রে ঐ জল মানবাকার, মহিষপাত্রে মহিষাকার ও মৎস্যপাত্রে মৎস্যাকার ধারণ করিল। এই প্রত্যেক পাত্রেই জল ছাড়া আর কিছুই নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধেও তদ্রূপ। মানব ঈশ্বরকে মানবরূপেই দর্শন করে, পশুগণ পশুরূপেই দর্শন করিয়া থাকে। প্রত্যেকে নিজ নিজ আদর্শানুযায়ী তাঁহাকে দেখিয়া থাকে। এইরূপেই কেবল তাঁহাকে দর্শন করা যাইতে পারে। আপনাকে তাঁহাকে এই মানবরূপেই উপাসনা করিতে হইবে, কারণ, ইহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

দুই প্রকার ব্যক্তি ভগবান্‌কে মানবভাবে উপাসনা করে না—এক, পশুপ্রকৃতি মানব—তাহার কোনরূপ ধর্ম্মই নাই, আর দ্বিতীয়, পরমহংস (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী)—যিনি মানবভাবের

বাহিরে গিয়াছেন, যিনি নিজ দেহ মনকে দূরে ফেলিয়াছেন, যিনি প্রকৃতির সীমার বাহিরে গিয়াছেন। সমুদয় প্রকৃতিই তাঁহার আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মনও নাই, দেহও নাই—তিনিই ঈশ্বরকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপে উপাসনা করিতে সমর্থ—যেমন যীশু ও বুদ্ধ, তাঁহারা ঈশ্বরকে মানবভাবে উপাসনা করিতেন না, ইহা হইল এক সীমা। আর এক সীমায় পশুভাবাপন্ন মানব।

অতি জড়প্রকৃতি ও পরমহংসই অবতারের উপাসনা করে না।

আর আপনারা সকলে জানেন, দুই বিরুদ্ধপ্রকৃতিক বস্তুর চরমাবস্থা কেমন একরূপ দেখায়। চূড়ান্ত অজ্ঞান ও চূড়ান্ত জ্ঞানের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ইহারা উভয়েই কাহারও উপাসনা করে না। চূড়ান্ত অজ্ঞানীরা নিজেদের দেহটাকে ব্রহ্ম ভাবিয়া থাকে; তাহারাই ব্রহ্ম, তবে আর তাহারা কাহার উপাসনা করিবে? আর চূড়ান্ত জ্ঞানীরা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন—আর ব্রহ্ম কিছু ব্রহ্মের উপাসনা করেন না। এই দুই চূড়ান্ত অবস্থার মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া যদি কেহ বলে, সে মনুষ্যরূপে ভগবানের উপাসনা করিবে না, তাহা হইতে সাবধান থাকিবেন। সে যে কি বলিতেছে, তাহার মর্ম্ম সে নিজেই জানে না; সে ভ্রান্ত, তাহার ধর্ম্ম ভাসাভাসা লোকের জন্য, উহা বৃথা বুদ্ধিশক্তির অপব্যবহার মাত্র।

অতএব ঈশ্বরকে মানবরূপে উপাসনা করা সম্পূর্ণ আবশ্যক। আর যে সকল জাতির উপাস্য এইরূপ মানবরূপধারী ঈশ্বর আছেন, তাঁহারা ধন্য। খ্রীষ্টিয়ানগণের পক্ষে খ্রীষ্ট এইরূপ মানবদেহধারী ঈশ্বর। অতএব আপনারা খ্রীষ্টকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকুন—তাঁহাকে কখনই ছাড়িবেন না। ভগবদ্দর্শনের

ইহাই স্বাভাবিক উপায়—মানবে ঈশ্বর দর্শন। আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সমুদয় ধারণাই তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। খ্রীষ্টিয়ানেরা কেবল এইটুকু গণ্ডি কাটিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ভগবানের অন্যান্য অবতার মানেন না, কেবল খ্রীষ্টকেই মানেন। তিনি ভগবানের অবতার ছিলেন, বুদ্ধও তাহাই ছিলেন, আরও শত শত অবতার হইবেন। ঈশ্বরের কোথাও 'ইতি' করিবেন না, ঈশ্বরকে যতদূর ভক্তি করা উচিত বিবেচনা করেন, খ্রীষ্টকে ততদূর ভক্তিশ্রদ্ধা করুন। এইরূপ উপাসনাই একমাত্র সম্ভব। ঈশ্বরকে উপাসনা করা যাইতে পারে না, তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়া সমগ্র জগতে বিরাজিত আছেন। তিনি কি এক হাতে পুরস্কার ও অপর হাতে দণ্ড লইয়া আমাদের পূজা গ্রহণের জন্য বসিয়া থাকিতে পারেন? ভাল কাজ করিলে পুরস্কার পাইবেন, মন্দ কাজ করিলে দণ্ড পাইতে হইবে! মানবরূপে প্রকাশিত তাঁহার অবতারের নিকটই আমরা প্রার্থনা করিতে পারি। যদি খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রার্থনা করিবার সময় "খ্রীষ্টের নাম" বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করেন, তবে খুব ভাল হয়; ঈশ্বরের নামে প্রার্থনা ছাড়িয়া কেবল খ্রীষ্টের নিকট প্রার্থনার প্রথা প্রচলিত হইলে খুব ভাল হয়। ঈশ্বর মানবের দুর্ব্বলতা বুঝেন এবং মানবের কল্যাণের জন্য মানবরূপ ধারণ করেন। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি মানবের হিতার্থ জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকি।" *

খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকুন, কিন্তু উদার হউন

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥—গীতা—৪।৭

"মূঢ় ব্যক্তিগণ—জগতের সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর আমি যে মানবাকার ধারণ করিয়াছি, তাহা না জানিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে ও মনে করে—ভগবান্ আবার কিরূপে মানবরূপ ধরিবেন।"* তাহাদের মন আসুরিক অজ্ঞানরূপ মেঘে আবৃত বলিয়া তাহারা তাঁহাকে জগতের ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না। এই মহান্ ঈশ্বরাবতারগণকে উপাসনা করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারাই একমাত্র উপাসনার যোগ্য—আর তাঁহাদের আবির্ভাবের বা তিরোভাবের দিনে আমাদের তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তিপ্রদর্শন করা উচিত। খ্রীষ্টের উপাসনা করিতে হইলে, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আমি সেই ভাবে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করিব। তাঁহার জন্মদিনে আমি না খাইয়া বরং উপবাস ও প্রার্থনা করিয়া কাটাইব। যখন আমরা এই মহাত্মাগণের চিন্তা করি, তখন তাঁহারা আমাদের আত্মার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন এবং আমাদিগকে তাঁহাদিগের সদৃশ করিয়া লয়েন।

কিন্তু আপনারা যেন খ্রীষ্ট বা বুদ্ধকে শূন্যসঞ্চরণকারী ভূত-প্রেতাদির সহিত এক করিয়া ফেলিবেন না। কি পাপ! খ্রীষ্ট ভূত-নামানর দলে আসিয়া নাচিতেছেন! আমি এই দেশে (আমেরিকায়) এ সব বুজরুকি দেখিয়াছি। ভগবানের এই সব অবতারগণ এই ভাবে আসেন না—তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ স্পর্শ করিলেই মানবের মধ্যে তাহার ফল প্রত্যক্ষ হইবে। খ্রীষ্টের স্পর্শে মানবের সমগ্র আত্মাই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। খ্রীষ্ট যেরূপ

---

* অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥—গীতা—৯।১১

ছিলেন, সেই ব্যক্তিও তদ্রূপ হইয়া যাইবে। তাহার সমগ্র জীবন আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হইয়া যাইবে—তাহার শরীরের প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বাহির হইবে। খ্রীষ্টের চরিত্রের যতদূর শক্তি, তাঁহার রোগ আরোগ্যকরণে বা অন্যান্য আলৌকিক কার্য্যে কি সে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে? তিনি হীন, নিম্নাধিকারী জনগণের মধ্যে ছিলেন বলিয়া ঐ হীন কার্য্যগুলি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এ সকল অদ্ভুত ঘটনা কোথায় হয়?—য়াহুদীদের ভিতর; আর তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। আর কোথায় উহা হয় নাই?—ইউরোপে! ঐ সব অদ্ভুত কার্য্য য়াহুদীদের ভিতর হইল—যাহারা খ্রীষ্টকে ত্যাগ করিল—আর ইউরোপ তাঁহার শৈলোপদেশ (Sermon on the mount) গ্রহণ করিল। মানবাত্মা—সত্য যাহা তাহা গ্রহণ করিল এবং মিথ্যা যাহা তাহা ত্যাগ করিল। রোগ আরোগ্য বা অন্যান্য অদ্ভুত কার্য্যে খ্রীষ্টের মহত্ত্ব নহে—একটা মহা অজ্ঞানী লোকেও তাহা করিতে পারিত। অজ্ঞান ব্যক্তিগণও অপরকে আরোগ্য করিতে পারে—পিশাচপ্রকৃতি ব্যক্তিগণও অপরকে আরোগ্য করিতে পারে। অতি ভয়ানক আসুরীপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছে—আমি দেখিয়াছি। তাহারা মাটি হইতে ফলই করিয়া দিবে। আমি দেখিয়াছি, অনেক অজ্ঞান ও পিশাচপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ঠিক ঠিক বলিয়া দিতে পারে। আমি দেখিয়াছি, অনেক অজ্ঞান ব্যক্তি ইচ্ছা মাত্রে একবার দৃষ্টি করিয়া ভয়ানক ভয়ানক রোগ সকল আরাম

কিন্তু খ্রীষ্টের প্রকৃত ভাব ছাড়িয়া তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়ার দিকে ঝোঁক দিবেন না

করিয়াছে। অবশ্য এগুলি শক্তি বটে, কিন্তু অনেক সময়েই এগুলি পৈশাচিক শক্তি। খ্রীষ্টের শক্তি কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি—উহা চিরকাল থাকিবে—চিরকাল রহিয়াছে—সর্ব্বশক্তিমান্ বিরাট প্রেম ও তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ। লোকের দিকে চাহিয়াই তিনি যে তাহাদিগকে আরাম করিতেন, তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন—"পবিত্রাত্মারা ধন্য," তাহা এখনও লোকের মনে জীবন্তভাবে রহিয়াছে। যতদিন মানব বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন ঐ বাক্যগুলি অফুরন্ত মহীয়সী শক্তির ভাণ্ডারস্বরূপ হইয়া থাকিবে। যতদিন লোকে ঈশ্বরের নাম না ভুলিয়া যায়, ততদিন ঐ বাক্যাবলি বিরাজিত থাকিবে—উহাদের শক্তিতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া চলিবে—কখনই থামিবে না। যীশু এই শক্তিলাভেরই উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহার এই শক্তিই ছিল—ইহা পবিত্রতার শক্তি—আর ইহা বাস্তবিকই একটি যথার্থ শক্তি। অতএব খ্রীষ্টকে উপাসনা করিবার সময়, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার সময়, আমরা কি চাহিতেছি, এটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। অজ্ঞান-জনোচিত অলৌকিক শক্তির বিকাশ নহে—আমাদের চাহিতে হইবে আত্মার অদ্ভুত শক্তি—যাহাতে মানুষকে মুক্ত করিয়া দেয়, সমগ্র প্রকৃতির উপর তাহার শক্তি বিস্তার করে, তাহার দাসত্বতিলক মোচন করিয়া দেয় এবং তাহাকে ঈশ্বর দর্শন করায়।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা

ভক্তি দুই প্রকার। প্রথম, বৈধী ভক্তি বা অনুষ্ঠান, অপরটিকে মুখ্যা বা পরা ভক্তি বলে। ভক্তি শব্দে অতি নিম্নতম উপাসনা হইতে উচ্চতম অবস্থা পর্য্যন্ত বুঝায়। জগতের মধ্যে যে কোন দেশে বা যে কোন ধর্ম্মে যত প্রকার উপাসনা দেখিতে পান, প্রেমই সকলের মূলে। অবশ্য ধর্ম্মের ভিতর অনেকটা কেবল অনুষ্ঠান মাত্র —আবার অনেকটা অনুষ্ঠান না হইলেও প্রেম নহে, তদপেক্ষা নিম্নতর অবস্থা। যাহা হউক, এই অনুষ্ঠানগুলির আবশ্যকতা আছে। আত্মার উন্নতিপথে আরোহণের জন্য এই বৈধী বা বাহ্য ভক্তির সহায়তা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। মানুষে এই একটা মস্ত ভুল করিয়া থাকে—তাহারা মনে করে, তাহারা একেবারে লাফাইয়া সেই চরমাবস্থায় পঁহুছিতে সমর্থ। শিশু যদি মনে করে, সে একদিনেই বৃদ্ধ হইবে, তবে সে ভ্রান্ত। আর আমি আশা করি, আপনারা সর্ব্বদাই এইটি মনে রাখিবেন যে, বই পড়িলেই ধর্ম্ম হয় না, তর্ক বিচার করিতে পারিলেই ধর্ম্ম হয় না, অথবা কতকগুলি মতবাদে সম্মতি প্রকাশ করিলেই ধর্ম্ম হয় না। তর্কযুক্তি, মতামত, শাস্ত্রাদি বা অনুষ্ঠান—এগুলি সবই ধর্ম্মলাভের সহায়ক মাত্র, কিন্তু ধর্ম্ম স্বয়ং অপরোক্ষানুভূতি-স্বরূপ। আমরা সকলেই বলি, একজন ঈশ্বর আছেন। জিজ্ঞাসা

বৈধী ভক্তি বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম্ম

করি, আপনারা কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন? সকলেই বলিয়া থাকে, শুনা যায়—স্বর্গে ঈশ্বর আছেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছে কি না—আর যদি কেহ বলে, আমি দেখিয়াছি, আপনারা তাহার কথায় হাসিয়া উঠিয়া তাহাকে পাগল বলিবেন। অনেকের পক্ষে ধর্ম্ম কেবল একটা শাস্ত্রে বিশ্বাস মাত্র—কতকগুলি মত মানিয়া লওয়া মাত্র। ইহার বেশী আর তাহারা উঠিতে পারে না। আমি আমার জীবনে এমন ধর্ম্ম প্রচার করি নাই, আর ওরূপ ধর্ম্মকে আমি ধর্ম্ম নাম দিতেই পারি না। ঐ প্রকার ধর্ম্ম করার চেয়ে নাস্তিক হওয়াও শ্রেয়ঃ। কোনরূপ মতামতে বিশ্বাস করা না করার উপর ধর্ম্ম নির্ভর করে না। আপনারা বলিয়া থাকেন, আত্মা আছেন। আপনারা কি আত্মাকে কখন দেখিয়াছেন? আমাদের সকলেরই আত্মা রহিয়াছে, অথচ আমরা তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহার কারণ কি? আপনাদিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে ও আত্মদর্শনের কোনরূপ উপায় করিতে হইবে। নতুবা ধর্ম্মসম্বন্ধে কথা কহা বৃথা। যদি কোন ধর্ম্ম সত্য হয়, তবে উহা অবশ্যই আমাদিগকে নিজ হৃদয়ে আত্মা, ঈশ্বর ও সত্যের দর্শনে সমর্থ করিবে। এই সব মতামত বা শাস্ত্রাদির কোন একটা লইয়া যদি আপনাতে আমাতে অনন্তকালের জন্য তর্ক করি, তথাপি আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব না। লোকে ত যুগযুগান্তর ধরিয়া তর্ক বিচার করিতেছে—কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে? মনবুদ্ধি ত সেখানে একেবারেই পঁহুছিতে পারে না। আমাদিগকে মনবুদ্ধির পারে যাইতে হইবে। অপরোক্ষানুভূতিই ধর্ম্মের প্রমাণ। এই দেয়ালটা

যে আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, আমরা উহা দেখিতেছি। যদি আপনারা চুপচাপ বসিয়া শত শত যুগ ধরিয়া ঐ দেয়ালের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব লইয়া বিচার করিতে থাকেন, তবে আপনারা কোন কালে উহার মীমাংসা করিতে পারিবেন না; কিন্তু যখনই দেয়ালটি দেখিবেন, অমনি সব বিবাদ মিটিয়া যাইবে। তখন যদি জগতের সকল লোক মিলিয়া আপনাকে বলে, ঐ দেয়াল নাই, আপনি তাহাদিগের বাক্য কখনই বিশ্বাস করিবেন না; কারণ আপনি জানেন যে আপনার নিজ চক্ষুর্দ্বয়ের সাক্ষ্য জগতের সমুদয় মতামত ও গ্রন্থরাশির প্রমাণ অপেক্ষা বলবান্। আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ বিজ্ঞানবাদ (Idealism) সম্বন্ধে—যাহাতে বলে এই জগতের অস্তিত্ব নাই, আপনাদেরও অস্তিত্ব নাই—অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন। আপনারা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করেন না, কারণ, তাহারা নিজেরা নিজেদের কথায় বিশ্বাস করে না। তাহারা জানে যে, ইন্দ্রিয়গণের সাক্ষ্য এইরূপ সহস্র সহস্র বৃথা বাগাড়ম্বর হইতে বলবান্। আপনাদিগকে প্রথমেই সব গ্রন্থাদি ফেলিয়া দিতে হইবে—উহাদিগকে এক পাশে ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে। বই যত কম পড়েন, ততই ভাল।

এক সময়ে নানা ভাব লইয়া চিত্ত চঞ্চল করা উচিত নহে

এক একবারে একটা করিয়া কাজ করুন। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য দেশসমূহে একটা ঝোঁক দেখা যায় যে,—তাঁহারা মাথার ভিতর নানাপ্রকার ভাব লইয়া এক ডালখিচুড়ি পাকাইতেছেন—সর্ব্বপ্রকার ভাবের বদ্ হজম মাথার ভিতর তাল পাকাইয়া একটা এলো-মেলো অসম্বদ্ধ রকমের হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সে গুলি যে মিলিয়া মিশিয়া একটা সুনির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে, তাহারও

অবকাশ পায় নাই। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ নানাপ্রকার ভাবগ্রহণ এক প্রকার রোগবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়—কিন্তু তাহাকে আদৌ ধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না।

তাহারা চায় খানিকটা স্নায়বীয় উত্তেজনা। তাহাদিগকে ভূতের কথা বলুন—কিম্বা উত্তর মেরু বা অন্য কোন দূরদেশনিবাসী পক্ষদ্বয়যুক্ত বা অন্য কোন আকারধারী লোকের কথা বলুন—যাহারা অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, আর যাহাদের কথা মনে হইলেই তাহাদের গা ছমছমাইয়া উঠে—এইসব বলিলেই তাহারা খুশি হইয়া বাড়ী যাইবে, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পার হইতে না হইতেই তাহারা আবার নূতন হুজুগ খুঁজিবে। কেহ কেহ ইহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে ধর্ম্মলাভ না হইয়া বাতুলালয়েই গতি হইয়া থাকে। এক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ ভাবের স্রোত চলিলে এই দেশটা একটা বৃহৎ বাতুলালয়ে পরিণত হইবে। দুর্ব্বল ব্যক্তি কখন ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না, আর এই সব ভূতুড়ে কাণ্ডে দুর্ব্বলতাই আসিয়া থাকে। অতএব ও সব দিক্‌ই মাড়াইবেন না —ও সব দিকেই যাইবেন না। উহাতে কেবল লোককে দুর্ব্বল করিয়া দেয়, মস্তিষ্কে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে, মনকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়, আত্মাকে অবনত করে, আর তাহার ফলে ঘোরতর বিশৃঙ্খলাই আসিয়া থাকে।

ভূতপ্রেতাদি অলৌকিক বিষয়ের অনুসন্ধান ধর্ম্ম নহে

আপনাদের যেন স্মরণ থাকে—ধর্ম্ম বচনে নাই, মতামতে নাই বা শাস্ত্রপাঠে নাই—ধর্ম্ম অপরোক্ষানুভূতিস্বরূপ। ধর্ম্ম কোনরূপ

শেখা নহে, ধর্ম্ম—হওয়া। 'চুরি করিও না,' এই উপদেশ সকলেই জানেন, কিন্তু তাহাতে কি হইল? যে ব্যক্তি চৌর্য্য ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অচৌর্য্যের যথার্থ তত্ত্ব জানিয়াছেন। 'অপরের হিংসা করিও না,' এই উপদেশ সকলেই জানেন, কিন্তু তাহাতে ফল কি? যাঁহারা হিংসাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই অহিংসাতত্ত্ব জানিয়াছেন, উহার উপর নিজেদের চরিত্র গঠিত করিয়াছেন।

কোন উপদেশ যথার্থভাবে প্রতিপালনেই সেই উপদেশের যথার্থ তাৎপর্য্য জ্ঞান

অতএব আমাদিগকে ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিতে হইবে, আর এই ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার করিতে অনেক দিন ধরিয়া অনেক চেষ্টা করিতে হয়। জগতের সকল ব্যক্তিই মনে করে, তাহার মত সুন্দর, তাহার মত বিদ্বান, তাহার মত শক্তিমান, তাহার মত অদ্ভুত লোক আর কেহ নাই। প্রত্যেক রমণীও তদ্রূপ জগতের মধ্যে আপনাকে পরমা সুন্দরী ও পরমা বুদ্ধিমতী জ্ঞান করে। আমি ত অসাধারণ নয় এমত একটি শিশুও দেখি নাই। সকল জননীই আমাকে একথা বলিয়া থাকেন—'আমার ছেলেটি কি অদ্ভুতপ্রকৃতি!' মানুষের প্রকৃতিই এই। সুতরাং যখন লোকে কোন অতি উচ্চ অদ্ভুত বিষয়ের কথা শুনে, তখন সকলেই মনে করে, তাহারা উহা অনায়াসে লাভ করিবে—এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হইয়া একথা ভাবে না যে, তাহাদিগকে কঠোর চেষ্টা করিয়া উহা লাভ করিতে হইবে। তাহারা তথায় লাফাইয়া যাইতে চায়। উহা সকলের চেয়ে বড় ত—তবে আর কি—আমরা উহা এখনই

সকলেই ফস্ করিয়া বড় হইতে চায়, কিন্তু তাহা অসম্ভব

চাই। আমরা কখন স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখি না যে, আমাদের উহা লাভ করিবার শক্তি আছে কি না, আর তাহার ফল এই হয় যে, আমরা কিছুই করিতে পারি না। আপনারা কোন ব্যক্তিকে বাঁশ দিয়া ঠেলিয়া ছাদের উপর উঠাইতে পারেন না—সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে সকলকেই উঠিতে হয়। অতএব এই বৈধী ভক্তি বা নিম্নাঙ্গের উপাসনাই ধর্ম্মের প্রথম সোপান।

বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা—স্থূলের সহায়ে সূক্ষ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার

নিম্নাঙ্গের উপাসনা কিরূপ? এইরূপ উপাসনা নানাবিধ। এই বিষয় বুঝাইবার জন্য আমি আপনাদিগকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। আপনারা সকলেই বলিয়া থাকেন, একজন ঈশ্বর আছেন, আর তিনি সর্ব্বব্যাপী। এখন একবার চোখ বুজিয়া, তিনি কি, ভাবুন দেখি। তাঁহাকে ভাবিতে গিয়া আপনাদের মনে কিসের ছবি উদয় হইতেছে? হয় আপনাদের মনে সমুদ্রের কথা, না হয় আকাশের কথা উদয় হইবে, অথবা একটা বিস্তৃত প্রান্তরের কথা বা আপনাদের নিজ জীবনে অন্য যে সব জিনিস দেখিয়াছেন, তাহাদেরই মধ্যে কোন একটির কথা আপনাদের মনে উদয় হইবে। তাহাই যদি হয়, তবে ইহা নিশ্চিত যে, 'সর্ব্বব্যাপী ভগবান্' এই বাক্য বলিলে আপনাদের মনে কোন ধারণাই হয় না। আপনাদের নিকট ঐ বাক্যের কোন অর্থই নাই। ভগবানের অন্যান্য গুণাবলী সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমাদের সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতির কি ধারণা আছে? কিছুই নাই। ধর্ম্ম অর্থে সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষানুভূতি, আর যখনই

আপনারা ভগবদ্ভাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন, তখনই আপনাদিগকে ঈশ্বরোপাসক বলিয়া স্বীকার করিব। তাহার পূর্ব্বে আপনাদের ঐ শব্দগুলির বানান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান নাই বলিতে হইবে। অতএব যেমন ছেলেদের অনেক সময় স্থূল অবলম্বনে শিখাইতে হয়, পরে তাহাদের সূক্ষ্মের ধারণা হয়, উক্ত অপরোক্ষানুভূতির অবস্থা লাভ করিতে হইলেও তদ্রূপ আমাদিগকে প্রথমে স্থূল অবলম্বনে অগ্রসর হইতে হইবে। পাঁচ দুগুনে দশ বলিলে একটা ছোট ছেলে কিছু বুঝিবে না, কিন্তু যদি পাঁচটী জিনিস দুইবার লইয়া দেখান যায় যে, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ দশটি জিনিস হইয়াছে তাহা হইলে সে উহা বুঝিবে। এই সূক্ষ্মের ধারণা অতি ধীরে ধীরে দীর্ঘকালে লাভ হইয়া থাকে। আমরা সকলেই শিশুতুল্য; আমরা বয়সে বড় হইয়া থাকিতে পারি এবং দুনিয়ার সব বই পড়িয়া থাকিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে আমরা শিশুমাত্র। এই প্রত্যক্ষানুভূতির শক্তিই ধর্ম্ম। বিভিন্ন মতামত, দর্শন বা ধর্ম্মনীতি গ্রন্থের ভাব লইয়া যতই মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া থাকুন না কেন, তাহাতে ধর্ম্মজীবনের বড় কিছু আসিয়া যাইবে না; ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে আপনাদের নিজেদের কি হইল, আপনাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কতটা হইল, এইটি বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। এই অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, আমরা ধর্ম্মরাজ্যে শিশু-তুল্য। আমাদের বুঝিতে হইবে, আমরা মতামত শাস্ত্রাদি শিখিয়াছি বটে, কিন্তু জীবনে আমাদের কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। আমাদিগকে এক্ষণে নূতন করিয়া আবার স্থূলের মধ্যে দিয়া সাধন আরম্ভ করিতে

হইবে—আমাদিগকে মন্ত্র, স্তবস্তুতি, অনুষ্ঠানাদির সহায়তা লইতে হইবে, আর এইরূপ বাহ্য ক্রিয়াকলাপ সহস্র সহস্র প্রকারের হইতে পারে।

সকলের পক্ষে এক প্রকার প্রণালীর কোন প্রয়োজন নাই। কতক লোকের মূর্ত্তিপূজায় ধর্ম্মপথে সাহায্য হইতে পারে, কতক লোকের না-ও হইতে পারে। কতক লোকের পক্ষে মূর্ত্তির বাহ্য-পূজার প্রয়োজন হইতে পারে, আবার অপর কাহারও কাহারও বা মনের মধ্যে ঐরূপ মূর্ত্তির চিন্তার প্রয়োজন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ মনের ভিতর মূর্ত্তির উপাসনা করে, সে অনেক সময় বলিয়া থাকে আমি মূর্ত্তিপূজক হইতে শ্রেষ্ঠ। আমি যখন অন্তরে মূর্ত্তিপূজা করিতেছি, তখন আমারই ঠিক ঠিক উপাসনা হইতেছে; যে বাহিরে মূর্ত্তি-পূজা করিতেছে, সে পৌত্তলিক। তাহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অনেক লোকে মন্দির বা চার্চ্চরূপ একটা সাকার বস্তু খাড়া করিয়া উহাকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যাকৃতি মূর্ত্তি গঠন করিয়া যদি তাহার পূজা করা হয়, তবে তাহাদের মতে উহা অতি ভয়াবহ। অতএব স্থূলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সূক্ষ্মে গমন করিবার নানাবিধ অনুষ্ঠান ও সাধনপ্রণালী আছে। ইহাদের মধ্য দিয়া সোপানক্রমে অগ্রসর হইয়া আমরা শেষে সূক্ষ্মানুভূতির যোগ্য হইব। আবার একপ্রকার সাধনপ্রণালী সকলের জন্য নহে। একপ্রকার সাধনপ্রণালী হয়ত আপনার উপযোগী, আবার অপর কাহারও পক্ষে হয়ত অন্যপ্রকার সাধনপ্রণালীর প্রয়োজন। সুতরাং সর্ব্ব-

সাধন প্রণালী অসংখ্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সাধন প্রণালী বিভিন্ন

প্রকার অনুষ্ঠানপ্রণালী যদিও এক চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়, তথাপি সকলগুলি সকলের উপযোগী নহে। আমরা সাধারণতঃ এই আর একটি ভুল করিয়া থাকি। আমার আদর্শ আপনার উপযোগী নহে—আমি কেন জোর করিয়া উহা আপনার ভিতরে দিবার চেষ্টা করিব? জগতের ভিতর ঘুরিয়া আসিবেন, দেখিবেন, সকল নির্ব্বোধ ব্যক্তিই আপনাকে বলিবে যে, তাহার সাধনপ্রণালীই একমাত্র সত্য আর অন্যান্য প্রণালী সব পৈশাচিকতাপূর্ণ, আর জগতের মধ্যে ভগবানের মনোনীত পুরুষ একমাত্র তিনিই জন্মিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমুদয় অনুষ্ঠানপ্রণালীর কোনটিই মন্দ নহে, সকলগুলিই আমাদিগকে ধর্ম্মসাক্ষাৎকারে সাহায্য করে; আর যখন মনুষ্যপ্রকৃতি নানাবিধ, তখন ধর্ম্মসাধনের বিভিন্নপ্রকার অনুষ্ঠানপ্রণালীও প্রয়োজন; আর এইরূপ বিভিন্ন সাধনপ্রণালী জগতে যত প্রচলিত থাকে, ততই জগতের পক্ষে মঙ্গল। যদি জগতে কুড়িটি ধর্ম্মপ্রণালী থাকে, তবে তাহা খুব ভাল, যদি চার শত ধর্ম্মপ্রণালী থাকে, আরও ভাল—কারণ, তাহা হইলে অনেকগুলির ভিতর যেটি ইচ্ছা বাছিয়া লইতে পারা যাইবে। অতএব ধর্ম্ম ও ধর্ম্মতত্ত্বসমূহের সংখ্যার বৃদ্ধিতে আমাদের বরং আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, কারণ, উহাতে সকল মানুষকে ধর্ম্মপথের পথিক করিবার উপায় হইতেছে, ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক মানবকে ধর্ম্মপথে সাহায্য করিবার উপায় হইতেছে আর আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ধর্ম্মের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাউক—যতদিন না প্রত্যেক লোকের অপর সকল ব্যক্তি হইতে পৃথক্ নিজের নিজের এক একটি ধর্ম্ম হয়। ভক্তিযোগীর ইহাই ধারণা।

এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, আমার ধর্ম্ম আপনার বা আপনার ধর্ম্ম আমার হইতে পারে না। যদিও সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক, তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তি মনের রুচি অনুসারে প্রত্যেককেই ভিন্ন পথ দিয়া যাইতে হয়, আর যদিও পথ বিভিন্ন, তথাপি সমুদয়ই সত্য ; কারণ, তাহারা একই চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়। একটি সত্য, অবশিষ্টগুলি মিথ্যা—তাহা হইতে পারে না। এই নিজ নিজ নির্ব্বাচিত পথকে ভক্তিযোগীর ভাষায় ইষ্ট বলে।

ইষ্ট

তারপর আবার শব্দ বা মন্ত্রশক্তির কথা উল্লেখ করা উচিত।

আপনারা সকলেই শব্দশক্তির কথা শুনিয়াছেন। এই শব্দগুলি কি অদ্ভুত! প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থে—বেদ, বাইবেল, কোরান, এই সকলগুলিতেই শব্দশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি শব্দ আছে—মানবজাতির উপর তাহাদের আশ্চর্য্য প্রভাব! তারপর আবার ভক্তিলাভের বাহ্যসহায়স্বরূপ বিভিন্নভাবোদ্দীপক বস্তু আছে। আর এইগুলিরও মানবমনের উপর প্রবল প্রভাব! কিন্তু বুঝিতে হইবে—ধর্ম্মের প্রধান প্রধান ভাবোদ্দীপক বস্তুগুলি ইচ্ছামত বা খেয়ালমত কল্পিত হয় নাই। সেগুলি ভাবের বাহ্যপ্রকাশ মাত্র। আমরা সর্ব্বদাই রূপক-সহায়তায় চিন্তা করিয়া থাকি ; আমাদের সকল শব্দগুলিই উহাদের অন্তরালস্থ চিন্তার রূপক মাত্র, আর বিভিন্ন লোক ও বিভিন্ন জাতি, হেতু না জানিয়াও বিভিন্ন ভাবোদ্দীপক বস্তু সাধনার্থ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উহারা তাহাদের অন্তরালস্থ ভাবের প্রকাশ মাত্র,

শব্দ ও মন্ত্রশক্তি

ভক্তির অন্যান্য বাহ্য সহায়

সুতরাং ঐ বস্তুগুলি সেই সেই ভাবের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ, আর যেমন ভাব হইতে বহির্দ্দেশস্থ ভাবোদ্দীপক বস্তু সহজেই আসিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ বস্তুও আবার ভাবোদ্রেকে সমর্থ। এইহেতু ভক্তিযোগের এই অংশে এই সব ভাবোদ্দীপক বস্তু, শব্দ বা মন্ত্রশক্তি ও প্রার্থনা বা স্তবস্তুতির কথা আছে।

ভগবান্ ব্যতীত অন্য কোন জিনিস প্রার্থনা—ভক্তি নহে

সকল ধর্ম্মেই প্রার্থনা আছে—তবে এইটুকু আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনসম্পদ্ বা আরোগ্যের জন্য প্রার্থনাকে ভক্তি বলা যায় না—এগুলি কর্ম্ম। স্বর্গাদি গমনের জন্য প্রার্থনা বা কোন প্রকার বাহ্য বস্তু লাভের জন্য প্রার্থনা কর্ম্মমাত্র। যিনি ভগবান্‌কে ভালবাসিতে চাহেন, যিনি ভক্ত হইতে চাহেন, তাঁহাকে ঐ সমুদয় কামনাগুলিকে একটি পুঁটুলী বাঁধিয়া ভক্তিগৃহের দ্বারের বাহিরে ফেলিয়া আসিতে হইবে, তবে তিনি উহাতে প্রবেশাধিকার পাইবেন। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহা পাওয়া যায় না; যা চাওয়া যায় সবই পাওয়া যায়। তবে উহা অতি হীনবুদ্ধির, নিম্নাধিকারীর, ভিখারীর ধর্ম্ম।—"উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।"—মূর্খ সে, যে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য কূপ খনন করে!—মূর্খ সে, যে হীরকখনিতে আসিয়া কাচখণ্ডের অন্বেষণ করে! ভগবান্ হীরকখনিস্বরূপ, আর এ সব ধন-মান-ঐশ্বর্য্য—এগুলি কাচখণ্ডস্বরূপ। এই দেহ এক দিন নষ্ট হইবেই; তবে আর বারংবার ইহার স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করা কেন? স্বাস্থ্যে ও ঐশ্বর্য্যে আছে কি? শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিও নিজ ধনের অত্যল্প অংশমাত্র স্বয়ং ব্যবহার

করিতে পারেন। তিনি আর চার পাঁচবার করিয়া ভোজ খাইতে পারেন না, অধিক বস্ত্রও ব্যবহার করিতে পারেন না, একজন লোক যতটা বায়ু নিশ্বাসযোগে গ্রহণ করিতে পারে, তাহার অধিক লইতে পারেন না। তাঁহার নিজের দেহের জন্য যতটা জায়গা লাগে, তাহা অপেক্ষা অধিক স্থানে তিনি শুইতে পারেন না। আমরা এই জগতের সকল বস্তু কখনই পাইতে পারি না। আর যদি না পাই, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এই দেহ একদিন যাইবেই—এ সব জিনিসের জন্য কে ব্যস্ত হইবে? যদি ভাল ভাল জিনিস আসে, আসুক—যদি সেগুলি চলিয়া যায়—যাক্, তাহাও ভাল। আসিলেও ভাল, না আসিলেও ভাল। কিন্তু ভগবানের নিকট গিয়া এ জিনিস ও জিনিস চাওয়া ভক্তি নহে। এগুলি ধর্ম্মের নিম্নতম সোপানমাত্র। উহারা অতি নিম্নাঙ্গের কর্ম্মমাত্র। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা—সেই রাজরাজেশ্বরের সামীপ্যলাভের চেষ্টা উহাপেক্ষা উচ্চতর। আমরা তথায় ভিক্ষুকের বেশে, ভিক্ষুকের ন্যায় চীর-পরিহিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে মললিপ্ত হইয়া উপস্থিত হইতে পারি না। যদি আমরা কোন সম্রাটের সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে চাই, আমাদিগকে কি তথায় যাইতে দেওয়া হইবে? কখনই নহে। দ্বারবানেরা আমাদিগকে গেট হইতে তাড়াইয়া দিবে। ভগবান্ রাজার রাজা, সম্রাটের সম্রাট; তথায় ভিক্ষুকের চীর পরিধান করিয়া প্রবেশের অধিকার নাই; তথায় দোকানদারের প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে কেনাবেচা একেবারেই চলিবে না। আপনারা বাইবেলেও পড়িয়াছেন যে, যীশু ভগবানের মন্দির হইতে ক্রেতা-বিক্রেতাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সকামীদের ভাব এই,—

"ঈশ্বর, আমি তোমাকে আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা উপহার দিতেছি, তুমি আমাকে একটি নূতন পোষাক দাও। ভগবান্, আজ আমার মাথাধরাটা সারাইয়া দাও, আমি কাল আরো তুঘণ্টা অধিকক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা করিব।" এইরূপ নিম্নাঙ্গের সকাম প্রার্থনাকারী অপেক্ষা আপনারা একটু উচ্চাবস্থাপন্ন, একথা ভাবিবেন। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের জন্য প্রার্থনা করা অপেক্ষা আপনাদের জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। মানুষে আর পশুতে ইহাই প্রভেদ। পশুর ভিতরকার অস্ফুট মনঃশক্তি সমুদয় তাহার দেহেই সীমাবদ্ধ। মানুষ যদি নিজের সমুদয় মনঃশক্তি ঐরূপ পশুবৎ কার্য্যেই ব্যয় করে, তবে মানুষ ও পশুর ভিতর কি প্রভেদ—দেখাও।

অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, ভক্ত হইতে গেলে প্রথমেই এই সব স্বর্গাদিগমনের বাসনা পরিহার করিতে হইবে। এইরূপ স্বর্গ এই সব স্থানেরই মত, তবে এখানকার অপেক্ষা কিছু ভাল হইতে পারে। এখানে আমাদের কতকগুলি তুঃখ, কতকগুলি সুখ ভোগ করিতে হয়। তথায় না হয় তুঃখ কিছু কম হইবে, সুখ কিছু বেশী হইবে। আমাদের জ্ঞান কোন অংশে বাড়িবে না, উহা আমাদের পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগস্বরূপ মাত্র হইবে—হয়ত আমরা যথেষ্ট খাইতে পাইব, নয়ত খুব কম খাইতে পাইব। হয়ত আমরা আকাশের মধ্য দিয়া বাতুড়ের ন্যায় উড়িয়া যাইবার শক্তি লাভ করিব, দেয়ালের ভিতর দিয়া লাফাইয়া যাইতে পারিব, সর্ব্বপ্রকার চালাকি খেলিতে পারিব, কিম্বা কোন ভূতুড়ের দলে গিয়া সং দেখাইতে পারিব। আমার মনে হয়, এইরূপ ভূতুড়ের দলে গিয়া ভূতের নৃত্য করা

স্বর্গ ইহলোকেরই উৎকৃষ্ট সংস্করণ মাত্র

অপেক্ষা নরকে যাওয়াও শ্রেয়। ভূতুড়ে দলে ভূতের নৃত্য করিতে বাধ্য হওয়া অপেক্ষা বরং আমি বাধ্য হইয়া পৃথিবীর ঘোর তমোময় প্রান্তে যাইতে প্রস্তুত আছি। খ্রীষ্টিয়ানের স্বর্গের ধারণা এই যে, উহা এমন এক স্থান যেখানে ভোগসুখ শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ স্বর্গ কিরূপে আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে? সম্ভবতঃ আপনারা এরূপ স্থানে শত শত বার গিয়াছেন, আবার তথা হইতে শত শত বার পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন।

সমস্যা এই, কিরূপে এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করা যাইবে। কিসে মানুষকে অসুখী করিয়া থাকে? মানুষ এই সকল প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ দাসতুল্য মাত্র। প্রকৃতির হাতের পুতুলস্বরূপ—তিনি ক্রীড়নকের ন্যায় তাহাদিগকে কখন এদিকে, কখন সেদিকে ফিরাইতেছেন। খুব বড় লোক—যথা একজন সম্রাটের কথা ভাবুন। সম্রাট্ হইলে কি হয়, ধরুন তাঁহার ক্ষুধা লাগিল। তখন যদি খাদ্য না পান তবে তিনি একেবারে লাফাইতে থাকিবেন—পাগল হইয়া যাইবেন। অতি সামান্য কিছুতে যাহার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, সেই এই দেহের আমরা সর্ব্বদা যত্ন করিতেছি, আর সেই হেতুই সর্ব্বদা ভয়ব্যাকুল-চিত্তে বাস করিতেছি। আমি সেদিন পড়িতেছিলাম—জনৈক ব্যক্তি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, হরিণকে ভয়ের দরুণ, প্রত্যহ গড়ে ৬০।৭০ মাইল দৌড়াইতে হয়। অনেক মাইল দৌড়াইয়া গেল, তার পর কিছু খাইল। যিনি এরূপ গণনা করিয়াছেন, তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, আমরা হরিণ অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশা-

মানুষ প্রকৃতির দাস—তাহাকে এই দাসত্ব অতিক্রম করিতে হইবে

গ্রস্ত। হরিণ তবু খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে পায়, আমরা তাহাও পাই না। হরিণ যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস পাইলেই তৃপ্ত হয়, আমরা কিন্তু ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়াইতেছি। ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়ান আমাদের রোগবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এমন অপ্রকৃতিস্থ ও বিকারগ্রস্ত হইয়াছি যে, কোন স্বাভাবিক বস্তুই আর আমাদের তৃপ্তিসাধনে সমর্থ নহে। আমাদের প্রত্যেক স্নায়ু বিষ ও রোগবীজে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে—সেইজন্য আমরা সর্ব্বদাই অস্বাভাবিক বস্তু খুঁজিতেছি—অস্বাভাবিক উত্তেজনা, অস্বাভাবিক খাদ্যপানীয়, অস্বাভাবিক সঙ্গ ও জীবন খুঁজিতেছি। বায়ু প্রথমে বিষাক্ত হওয়া চাই, তবেই আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে সমর্থ হইতে পারি! ভয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই,—আমাদের সমগ্র জীবনটা কতকগুলা ভয়ের সমষ্টি ছাড়া আর কি? হরিণের ভয় করিবার এক প্রকার জিনিস অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদি আছে, মানবের সমগ্র জগৎ।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, আমরা কিরূপে এই বন্ধনশৃঙ্খল ভগ্ন করিব? একথা বলিতে বেশ—আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, ভগবানের কথায় আমাদের কাজ কি? আমি দেখিতে পাই, হিতবাদিগণ (Utilitarians) আসিয়া বলেন, 'ঈশ্বর ও এতদ্বিধ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না। আমরা ওসবের কোন ধার ধারি না। এই জগতে সুখে বাস করিতে চাই।' যদি তাহা সম্ভব হইত, তবে আমিই প্রথমে ইহা করিতাম, কিন্তু জগৎ আমাদিগকে ত তাহা করিতে দিবে না। আপনারা যতদিন প্রকৃতির দাসস্বরূপ রহিয়াছেন, ততদিন সুখভোগ করিবেন কিরূপে? যতই চেষ্টা করিবেন, ততই

আরও ঘোরতর অজ্ঞান আপনাদিগকে আবৃত করিবে। জানি না, কত বর্ষ ধরিয়া আপনারা উন্নতির জন্য কত মতলব আঁটিতেছেন, কিন্তু যেমন এক এক বর্ষ যাইতে থাকে, ক্রমশঃ অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকে। দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে তদানীন্তন পরিচিত জগতে লোকের অতি অল্পই অভাব ছিল, কিন্তু যেমন তাহাদের জ্ঞান একগুণ বাড়িতে লাগিল, অভাবও শতগুণ বাড়িয়া চলিল। আমরা ভাবি, অন্ততঃ যখন আমরা উদ্ধার হইব, তখন আমাদের বাসনা সব পূর্ণ হইবে—তাই আমরা স্বর্গে যাইতে চাই। সেই অনন্ত অদম্য পিপাসা! সর্ব্বদাই একটা কিছু চাওয়া! নিঃস্ব ভিক্ষুক চায় কেবল টাকা, টাকা, টাকা। টাকা হইলে আবার অন্যান্য জিনিস চায়, সমাজের সঙ্গে মিশিতে চায়, তারপর আবার অন্য কিছু চায়। কিরূপে আমাদের এই তৃষ্ণা মিটিবে? যদি আমরা স্বর্গে যাই, তাহাতে বাসনা আরও বাড়িয়া যাইবে। যদি দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হয়, তাহাতে তাহার বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং যেমন অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিলে অগ্নির তেজ আরও বাড়িতে থাকে, তদ্রূপ তাহারও বাসনার বৃদ্ধি হইতে থাকে। স্বর্গে যাওয়ার অর্থ খুব বড় মানুষ হওয়া—আর তাহা হইলেই বাসনা আরও বাড়িতে থাকিবে। জগতের বিভিন্ন শাস্ত্রে পড়া যায়, স্বর্গেও অনেক দুষ্টামি, অন্যায় হইয়া থাকে। স্বর্গে যাহারা যায়, তাহারাই যে খুব ভাল লোক, তাহা নহে, আর তার পর এই স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা কেবল ভোগবাসনা মাত্র। এইটি ছাড়িয়া দিতে হইবে। স্বর্গে

স্বর্গে যাইবার বাসনা ছাড়িয়া ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে প্রকৃতির দাসত্ব অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই

যাওয়া ত অতি ছোট কথা, অতি হীনবুদ্ধি ব্যক্তির কথা। আমি লক্ষপতি হইব এবং লোকের উপর প্রভুত্ব করিব, এ ভাব যেরূপ, স্বর্গে যাইবার ইচ্ছাও তদ্রূপ। এইরূপ স্বর্গ অনেক আছে, কিন্তু এগুলি না ছাড়িলে ধর্ম্ম ও ভক্তির দ্বারদেশে প্রবেশেরও অধিকার পাইবেন না।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

'প্রতীক' ও 'প্রতিমা'—দুইটি সংস্কৃত শব্দ। আমরা এক্ষণে এই 'প্রতীক' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 'প্রতীক' শব্দের অর্থ—অভিমুখী হওয়া, সমীপবর্তী হওয়া। সকল দেশেই আপনারা উপাসনার নানাবিধ সোপান রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখুন, এই দেশে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সাধুগণের প্রতিমা পূজা করেন, এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রূপ ও ভাবোদ্দীপক বস্তুবিশেষের উপাসনা করেন। আবার অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর উপাসনা করেন, আর তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতেছে। আমি পরলোকগত প্রেত-উপাসকদের কথা বলিতেছি। আমি পুস্তকপাঠে অবগত হইয়াছি যে, এখানে প্রায় ৮০ লক্ষ প্রেতোপাসক আছেন। তারপর আবার অপর কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা তদপেক্ষা উচ্চতর প্রাণী অর্থাৎ দেবাদির উপাসনা করেন। ভক্তিযোগ এই সকল বিভিন্ন সোপানগুলির কোনটিতেই দোষারোপ করেন না, কিন্তু এই সমুদয় উপাসনাগুলিকেই এক প্রতীকোপাসনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। এই সকল উপাসকগণ প্রকৃত-

প্রতীকোপাসনা—উহা দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, ফলবিশেষ হয়

পক্ষে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না, কিন্তু প্রতীক অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্নিহিত কোন বস্তুর উপাসনা করিতেছেন, এই সকল বিভিন্ন বস্তুর সহায়ে ঈশ্বরের নিকট পঁহুছিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রতীকোপাসনায় আমাদের মুক্তিলাভ হয় না, আমরা যে যে বিশেষ বস্তুর কামনায় উহাদের উপাসনা করি, উহাতে সেই সেই বিশেষ বস্তুই কেবল লাভ হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষ বা বন্ধুবান্ধবের উপাসনা করেন, সম্ভবতঃ তিনি তাহাদের নিকট হইতে কতকগুলি শক্তি বা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এই সকল বিশেষ বিশেষ উপাস্য বস্তু হইতে যে বিশেষ বস্তু লাভ হয়, তাহাকে বিদ্যা অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান বলে, কিন্তু আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তি কেবল স্বয়ং ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে। বেদব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বয়ং সগুণ ঈশ্বরও প্রতীক। সগুণ ঈশ্বর প্রতীক হইতে পারেন, কিন্তু প্রতীক, সগুণ বা নির্গুণ কোন প্রকার ঈশ্বর নহে। উহাদিগকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করা যায় না। অতএব লোকে যদি মনে করে যে, দেব, পূর্ব্বপুরুষ, মহাত্মা, সাধু বা পরলোকগত প্রেতরূপ বিভিন্ন প্রতীকসমূহের উপাসনা দ্বারা তাহারা কখনও মুক্তিলাভ করিবে, তবে ইহা তাহাদের মহাভ্রম। বড় জোর উহা দ্বারা তাহারা কতকগুলি শক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল উপাসনার উপর দোষারোপ করিবার প্রয়োজন নাই, উহাদের প্রত্যেকটিতেই

ফলবিশেষ লাভ হয়, আর যে ব্যক্তি আর বেশী কিছু বুঝে না, সে এই সকল প্রতীকোপাসনা হইতে কিছু কিছু শক্তি ও কামনার সিদ্ধি লাভ করিবে। তারপর অনেকদিন ভোগ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর যখন সে মুক্তিলাভের জন্য প্রস্তুত হইবে, তখন সে আপনা আপনিই এই সব প্রতীকোপাসনা ত্যাগ করিবে।

এই সকল বিভিন্ন প্রতীকোপাসনার মধ্যে পরলোকগত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়গণের উপাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা সমাজে অধিক প্রচলিত। ব্যক্তিগত ভালবাসা—আমাদের বন্ধুবান্ধবগণের দেহের প্রতি ভাল-বাসা—এই মানবপ্রকৃতি আমাদের মধ্যে এতদূর প্রবল যে, তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের দেহ আবার দেখিতে অভিলাষী হই—আমরা দেহের প্রতি এতদূর আসক্ত! আমরা ভুলিয়া যাই যে, যখন তাঁহারা জীবিত ছিলেন, তখনই তাঁহাদের দেহ ক্রমাগত পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছিল—আর মৃত্যু হইলেই আমরা ভাবিয়া থাকি যে, তাঁহাদের দেহ অপরিণামী হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা তাঁহাদিগকে তদ্রূপ দেখিব। শুধু তাহাই নহে, আমার যদি কোন বন্ধু বা পুত্র জীবদ্দশায় অতিশয় দুষ্ট-প্রকৃতির ছিল এরূপ হয়, তথাপি তাহার মৃত্যু হইবা মাত্র আমরা মনে করিতে থাকি, তাহার মত সাধু, তাহার মত দেব প্রকৃতির লোক আর জগতে কেহ নাই—তাহাকে আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর করিয়া তুলি। ভারতে এমন লোক অনেক আছে, যাহারা কোন শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ করে না, মৃত্তিকার নিম্নে সমাধিস্থ করে ও তাহার উপরে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকে এবং

পরলোকগত আত্মীয়-বান্ধবের উপাসনা এক প্রকার প্রতী-কোপাসনা

সেই শিশুটিই সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা হইয়া থাকে। সকল দেশেই এই প্রকারের ধর্ম্ম খুব প্রচলিত এবং এমনও দার্শনিকের অভাব নাই, যাঁহাদের মতে ইহাই সকল ধর্ম্মের মূল। অবশ্য তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিতে পারেন না।

যাহা হউক, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই প্রতীক-পূজা আমাদিগকে কখনই মুক্তি দিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা আছে। বিপদাশঙ্কা এই যে, এই প্রতীক বা সমীপকারী সোপানপরম্পরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর একটি অগ্রবর্ত্তী সোপানে উপস্থিত হইবার সহায়তা করে, ততক্ষণ উহারা দোষাবহ নহে বরং উপকারী, কিন্তু আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন লোক সারা জীবন প্রতীকোপাসনায়ই লাগিয়া থাকে। সম্প্রদায়বিশেষের ভিতর জন্মান ভাল, কিন্তু উহাতে নিবদ্ধ থাকিয়াই মরা ভাল নয়। স্পষ্টতর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এমন কোন সম্প্রদায়ে জন্মান ভাল, যাহার মধ্যে কোন বিশেষ সাধনপ্রণালী প্রচলিত—উহাতে আমাদের আভ্যন্তরীণ ভাবসমূহ জাগরিত হইবার সহায়তা হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণভাব অবলম্বন করিয়াই মরিয়া যাই, আমরা উহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া কখন উন্নত হইতে—নিজ ভাবের বিকাশসাধন করিতে—পারি না। এই সকল প্রতীকোপাসনায় ইহাই প্রবল বিপদাশঙ্কা! লোকে আপনাদের নিকট বলিবে যে, এগুলি সোপান মাত্র—এই সকল সোপানের মধ্য

প্রতীকোপাসনায় বিপদাশঙ্কা—উহাতেই আবদ্ধ না থাকিয়া উহার সহায়তা লইয়া চরমাবস্থায় পেঁাছিবার চেষ্টা করিতে হইবে

দিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু যখন তাহারা বৃদ্ধ হয়, তখন তাহারা সেই সকল সোপান অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে, দেখা যায়; যদি কোন যুবক চার্চ্চে না যায়, তবে সে নিন্দার্হ; কিন্তু যদি কোন বৃদ্ধ চার্চ্চে গমন করে, সেও তদ্রূপ নিন্দার্হ, তাহার আর এই ছেলেখেলায় ত কোন প্রয়োজন নাই, চার্চ্চ তাহার পক্ষে এতদপেক্ষা উচ্চতর বস্তুলাভের সহায়স্বরূপ হওয়া উচিত ছিল। তাহার আর এই সব প্রতীক, প্রতিমা ও প্রবর্ত্তকের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকাণ্ডে কি প্রয়োজন?

প্রতীকোপাসনার আর এক প্রবল, অতিপ্রবল রূপ—শাস্ত্রোপাসনা। সকল দেশেই আপনারা দেখিবেন, গ্রন্থ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসে। আমার দেশে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া মানবরূপ পরিগ্রহ করেন—বিশ্বাস করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের মতে মানবরূপে অবতীর্ণ হইলে ঈশ্বরকেও বেদানুযায়ী চলিতে হইবে—আর যদি তাহার উপদেশ বেদানুযায়ী না হয়, তবে তাহারা সেই উপদেশ গ্রহণ করিবে না। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ের লোকেই বুদ্ধের পূজা করে, কিন্তু যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি তোমরা বুদ্ধের পূজা কর, তাহার উপদেশাবলী গ্রহণ কর না কেন? তাহারা বলিবে, তাহার কারণ—বুদ্ধের উপদেশে বেদ অস্বীকৃত হইয়া থাকে। গ্রন্থোপাসনা বা শাস্ত্রোপাসনার তাৎপর্য্য এইরূপ। একখানি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যত খুশি মিথ্যা বল না কেন, কিছুই দোষ নাই। ভারতে যদি আমি কোন নূতন বিষয় শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি—আর

গ্রন্থ বা শাস্ত্রোপাসনা—উহার দোষসমূহ

যদি অপর কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তির দোহাই না দিয়া, আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাই বলিতেছি, এইরূপ ভাবে ঐ সত্য প্রচার করিতে যাই—তবে কেহই আমার কথা শুনিতে আসিবে না ; কিন্তু আমি যদি বেদ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া জুয়াচুরি করিয়া উহার ভিতর হইতে খুব অসম্ভব অর্থ বাহির করিতে পারি—উহার যুক্তিসঙ্গত যে অর্থ হয়, তাহা উড়াইয়া দিয়া আমার নিজের কতকগুলি ধারণাকে বেদের অভিপ্রেত তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করি—তবে আহাম্মকেরা দলে দলে আসিয়া আমার অনুসরণ করিবে। তার পর আবার কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা এক অদ্ভুত রকমের খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন ; তাঁহাদের মত শুনিয়া সাধারণ খ্রীষ্টানগণ ভয় পাইবেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন, আমরা যাহা প্রচার করিতেছি, যীশুখ্রীষ্টেরও সেই মত ছিল—আর যত আহাম্মকেরা তাঁহাদের দলে মিশিয়া থাকে। বেদে বা বাইবেলে যদি না পাওয়া যায়, তবে এমন সব নূতন জিনিস লোকে লইতেই চায় না। স্নায়ুসমূহ যে ভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে, সেই দিকেই যাইতে চায়। যখন আপনারা কোন নূতন বিষয় শুনেন বা দেখেন, অমনি চমকিয়া উঠেন—ইহা মানুষের প্রকৃতি-গত। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, চিন্তা-ভাবাদি সম্বন্ধে এ কথা আরও বিশেষভাবে সত্য। মন দাগা বুলাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রকার নূতন ভাব গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অতি ভয়ানক, অতি কঠিন ; সুতরাং সেই ভাবটিকে সেই 'দাগা'র খুব কাছাকাছি রাখিতে হয়, তবেই আমরা ধীরে ধীরে উহা গ্রহণ করিতে পারি। লোককে কোন মতে লওয়াইবার এ উত্তম নীতি বা

কৌশল বটে, কিন্তু ইহা যথার্থ ন্যায়ানুগত নহে। এই সব সংস্কারক-গণ, আর আপনারা যাঁহাদিগকে উদারমতাবলম্বী প্রচারক বলেন, তাঁহারা আজকাল জানিয়া শুনিয়া কি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বলিতে-ছেন, তাহা ভাবিয়া দেখুন। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারা শাস্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন সেরূপ অর্থ হয় না, কিন্তু তাঁহারা যদি তাহা প্রচার না করেন, কেহই তাঁহাদের কথা শুনিতে আসিবে না। খ্রীষ্টীয় বৈজ্ঞানিকদের * মতে যীশু একজন মস্ত আরোগ্যকারী ছিলেন, প্রেততত্ত্ববাদীদের মতে তিনি একজন মস্ত ভূতুড়ে ছিলেন, আর থিওজফিষ্টদের মতে তিনি একজন মহাত্মা ছিলেন। শাস্ত্রের এক বাক্য হইতেই এই সব বিভিন্ন অর্থ বাহির করিতে হইবে! ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' এই বাক্যান্তর্গত 'সৎ' শব্দের অর্থ বিভিন্ন-বাদিগণ বিভিন্নরূপ করিয়াছেন। পরমাণুবাদিগণ বলেন, সৎ শব্দের অর্থ পরমাণু, আর ঐ পরমাণু হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিবাদিগণ বলেন, উহার অর্থ প্রকৃতি, আর প্রকৃতি হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। শূন্যবাদীরা বলেন, সৎ শব্দের অর্থ শূন্য, আর এই শূন্য হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরবাদিগণ

---

*Christian Scientists :— মার্কিণদেশীয় একটি প্রবল সম্প্রদায়ের নাম। মিসেস্ এডি নাম্নী মার্কিণমহিলা এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী। ইঁহাদের মতে জ্বর, রোগ, দুঃখ, পাপ প্রভৃতি মনের ভ্রম মাত্র। আমাদের কোন রোগ নাই, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলে আমরা সর্ব্বপ্রকার রোগমুক্ত হইব। ইঁহারা বলেন, আমরা খ্রীষ্টের মত প্রকৃতভাবে অনুসরণ করিতেছি। সুতরাং তিনি যেরূপ রোগীকে অলৌকিক উপায়ে রোগমুক্ত করিতেন, আমরাও তাহা করিতে সমর্থ।

বলেন, উহার অর্থ ঈশ্বর! আবার অদ্বৈতবাদীরা বলেন, উহার অর্থ সেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তা আর সকলেই ঐ এক শাস্ত্রীয় বাক্যকেই প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন!

গ্রন্থোপাসনায়ও এই সব দোষ, তবে উহার একটি মস্ত গুণও আছে—উহাতে একটা জোর আনিয়া দেয়। যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এক একখানি গ্রন্থ আছে, সেইগুলি ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই লোপ পাইয়াছে। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পারসীদের কথা শুনিয়াছেন। ইহারা প্রাচীন পারস্যবাসী—এক সময় ইহাদের সংখ্যা প্রায় দশ কোটী ছিল। আরবীয়েরা ইহাদিগের অধিকাংশকে পরাজিত করিয়া মুসলমান করিল। অল্প কয়েকজন তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া পলাইল—আর সেই ধর্ম্মগ্রন্থবলেই তাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে। শাস্ত্র ভগবানের সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। য়াহুদীদের কথা ভাবিয়া দেখুন। যদি তাঁহাদের একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ না থাকিত, তাঁহারা জগতে কোথায় মিলাইয়া যাইতেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। অতি ভয়ানক অত্যাচারেও তালমুদ (Talmud) তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। গ্রন্থের ইহাই একটি বিশেষ্ সুবিধা যে, উহা সমুদয় ভাবগুলিকে লইয়া মনোহর প্রত্যক্ষ আকারে লোকের সমক্ষে উপস্থিত করে, আর সর্ব্বপ্রকার প্রতিমার মধ্যে উহার ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। বেদীর উপর একখানি গ্রন্থ রাখুন—সকলেই উহা দেখিবে, একখানি ভাল গ্রন্থ হইলে সকলেই তাহা পড়িবে। আমাকে বোধ হয় আপনারা কতকটা পক্ষপাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন, কিন্তু

উহার গুণ

আমার মতে গ্রন্থের দ্বারা জগতে ভাল অপেক্ষা মন্দ অধিক হইয়াছে। এই যে নানা প্রকারের মতামত দেখা যায়, তাহার জন্য এই সকল গ্রন্থই দায়ী। মতামত সব গ্রন্থ হইতেই আসিয়াছে, আর গ্রন্থসকলই কেবল, জগতে যত প্রকার অত্যাচার ও গোঁড়ামি চলিয়াছে, তাহাদের জন্য দায়ী। বর্ত্তমান কালে গ্রন্থসমূহই সর্ব্বত্র মিথ্যাবাদীর সৃষ্টি করিতেছে! সকল দেশেই মিথ্যাবাদীর সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকি।

প্রতিমা

তার পর প্রতিমা সম্বন্ধে—প্রতিমার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। সমগ্র জগতে আপনারা কোন না কোন আকারে প্রতিমার ব্যবহার দেখিতে পাইবেন। কতকগুলি ব্যক্তি মানবাকার প্রতিমার অর্চ্চনা করিয়া থাকে, আর আমার বিবেচনায় উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিমা। আমার যদি প্রতিমাপূজার প্রয়োজন হয়, তবে আমি পশ্বাকৃতি, গৃহাকৃতি বা অন্য কোন আকৃতির প্রতিমা না করিয়া বরং মানবাকৃতি প্রতিমার উপাসনা করিব। এক সম্প্রদায় মনে করেন, এই প্রতিমাটিই ঠিক ঠিক প্রতিমা; অপরে মনে করেন, উহা ঠিক নয়। খ্রীষ্টীয়ান মনে করেন, ঈশ্বর যে ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু হিন্দুদের মতানুসারে তিনি যে গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, উহা সম্পূর্ণ ভ্রম ও কুসংস্কারাত্মক। য়াহুদীরা মনে করেন যে, দুই দিকে দুই দেবদূত বসান সিন্দুকের আকৃতি একটি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু নর বা নারীর আকারে যদি কোন প্রতিমা গঠিত হয়, তবে উহা ঘোরতর দোষাবহ। মুসলমানেরা মনে

করেন যে, তাঁহাদের প্রার্থনার সময় যদি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া কাবা নামক কৃষ্ণপ্রস্তরযুক্ত মন্দিরটির আকৃতি চিন্তা করিতে চেষ্টা করা যায় তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু চার্চ্চের আকৃতি ভাবিলেই তাহা পৌত্তলিকতা। প্রতিমাপূজায় এইরূপ গোঁড়ামি আসিবার আশঙ্কারূপ দোষ বিদ্যমান। তথাপি প্রতিমাপূজা প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মের চরমাবস্থায় আরোহণের জন্য প্রয়োজনীয় সোপানাবলী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুধু একখানি গ্রন্থের দোহাই দিলেই চলিবে না। কেবল শাস্ত্রের গোঁড়ামি না করিয়া আমরা নিজেরা যথার্থ কি বিশ্বাস করি, তাহা ভাবিতে হইবে। আপনি নিজে কি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, ইহাই প্রশ্ন। ঈশা, মুশা, বুদ্ধ এই এই করিয়াছেন বলিলে কি হইবে—যতদিন না আমরা নিজেরাও সেগুলি জীবনে পরিণত করিতেছি। আপনি যদি একটা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মুশা এই খাইয়াছিলেন বলিয়া চিন্তা করেন, তাহাতে ত আপনার পেট ভরিবে না—এইরূপ, মুশার এই এই মত ছিল জানিলেই আর আপনার উদ্ধার হইবে না। এ সকল বিষয়ে আমার মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কখন কখন আমার মনে হয়, এই সব প্রাচীন আচার্য্যগণের সহিত যখন আমার মত মিলিতেছে, তখন আমার মত অবশ্যই সত্য; আবার কখন কখন ভাবি, আমার সঙ্গে যখন তাঁহাদের মত মিলিতেছে, তখন তাঁহাদের মত ঠিক। আমি আপনাদের সকলকে ঐরূপ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বলি। এই সমস্ত বিশুদ্ধস্বভাব আচার্য্যগণের প্রতি গোঁড়া হইবেন না। তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ ভক্তি শ্রদ্ধা করুন, কিন্তু ধর্ম্মটাকে একটা স্বাধীন গবেষণার বস্তু বলিয়া দৃষ্টি করুন। তাঁহারা যেমন নিজেরা চেষ্টা করিয়া জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছিলেন,

আমাদিগকেও তদ্রূপ নিজের নিজের জন্য চেষ্টা করিয়া জ্ঞানালোক লাভ করিতে হইবে। তাঁহারা জ্ঞানালোক পাইয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের তৃপ্তি হইবে না। আপনাদিগকে বাইবেল হইতে হইবে; বাইবেলকে পথের আলোকস্বরূপে, পথপ্রদর্শক স্তম্ভ বা নিদর্শনস্বরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা করা ছাড়া উহার অনুসরণ করিতে হইবে না।

উহাদের মূল্য ঐ পর্যন্ত, কিন্তু প্রতিমাপূজাদি অত্যাবশ্যক। আপনারা মনকে স্থির করিবার অথবা কোনরূপ চিন্তা করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। আপনারা দেখিবেন, আপনারা মনে মনে মূর্তি গঠন না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। দুই প্রকার ব্যক্তির মূর্তিপূজার প্রয়োজন হয় না—নরপশু, যে ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না, আর সিদ্ধপুরুষ, যিনি এই সকল সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিয়াছেন। আমারা যতদিন এই দুই অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, ততদিন আমাদের ভিতরে বাহিরে কোন না কোন-রূপ আদর্শ বা মূর্ত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। উহা কোন পরলোকগত মানব হইতে পারে অথবা কোন জীবিত নর বা নারী হইতে পারে। ইহা অবশ্য ব্যক্তির উপর, দেহের উপর আসক্তি—আর ইহা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের স্বভাবই এই যে, আমরা সূক্ষ্মকে স্থূলে পরিণত করিয়া থাকি। যদি আমরাই এইরূপ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল না হইব, তবে আমরা এখানে এরূপ অবস্থায় রহিয়াছি কেন? আমরা স্থূলভাবাপন্ন আত্মা, আর সেই কারণেই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। সুতরাং মূর্ত্তিই যেমন আমাদিগকে এখানে আনিয়াছে, তেমনই মূর্ত্তির সহায়তায়ই আমরা ইহার বাহিরে যাইব। ইহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার

প্রতিমাপূজার আবশ্যকতা

মত—'বিষস্য বিষমৌষধম্'। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের দিকে গিয়া আমরা মানুষভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, আর মুখে আমরা যাহাই বলি না কেন, আমরা সাকার পুরুষসমূহের উপাসনা করিতে বাধ্য। বলা খুব সহজ বটে, সাকারের উপর আসক্ত হইও না, কিন্তু আপনারা দেখিবেন, যে একথা বলে, সেই ব্যক্তিই সাকারের উপর ঘোরতর আসক্ত—তাহার বিশেষ বিশেষ নরনারীর উপর তীব্র আসক্তি—তাহারা মরিয়া গেলেও তাহাদের প্রতি তাহার আসক্তি যায় না—সুতরাং মৃত্যুর পরেও সে তাহাদের অনুসরণেচ্ছুক। ইহার নামই পুতুলপূজা। ইহাই পুতুলপূজার বীজ, মূল কারণ; আর যদি কারণই রহিল, তবে কোন না কোন আকারে মূর্ত্তিপূজা থাকিবেই থাকিবে। কোন জীবিত মন্দপ্রকৃতি নর বা নারীর উপর আসক্তি অপেক্ষা খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের প্রতিমার উপর আসক্তি থাকা—টান থাকা—কি ভাল নয়?

আসল 'পুতুল-পূজা' কি

পাশ্চাত্যদেশীয়েরা বলিয়া থাকে, মূর্ত্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসা বড়ই খারাপ—কিন্তু তাহারা একটা স্ত্রীলোকের সাম্‌নে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে, 'তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জীবনের আলোক, তুমি আমার নয়নের আলো, তুমি আমার আত্মা' এই সব অনায়াসে বলিতে পারে। তাহাদের যদি চার পা থাকিত, তবে চার পায়েই হাঁটু গাড়িয়া বসিত! ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত পৌত্তলিকতা। পশুরা ঐরূপে হাঁটু গাড়িয়া বসিবে। একটা স্ত্রীলোককে আমার প্রাণ, আমার আত্মা বলার মানে কি? এভাব ত দুদিনের বেশী থাকে না—এ কেবল স্ত্রীপুরুষের দৈহিক আসক্তি মাত্র। তাহা যদি না হইবে, তবে পুরুষ পুরুষের নিকট ঐরূপে

হাঁটু গাড়িয়া বসে না কেন? পশুগণের মধ্যে যে কাম দেখিতে পান, উহাও সেই কামবৃত্তি—কেবল একরাস ফুলচাপা দেওয়া মাত্র। কবিরা উহার একটি সুন্দর নামকরণ করিয়া উহার উপর আতর, গোলাপ জল ছড়া দেন—তাহা হইলেও উহা কাম ছাড়া আর কিছুই নহে। লোকজিৎ জিন বুদ্ধের মূর্তির সমক্ষে এরূপে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তুমিই আমার জীবনস্বরূপ বলা কি উহা অপেক্ষা ভাল নহে? আমি কোন স্ত্রীলোকের সম্মুখে হাঁটু না গাড়িয়া বরং শত শত বার এইরূপ অনুষ্ঠান করিব।

আর এক প্রকার প্রতীক আছে—পাশ্চাত্য দেশে ঐরূপ প্রতীকোপাসনার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে উহার উল্লেখ আছে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা মনকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন—তাঁহারা বিভিন্ন বস্তুকে ঈশ্বর-রূপে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আর ঐ সমুদয় উপাসনাগুলির প্রত্যেকটি ভগবৎপ্রাপ্তির এক একটি সোপানস্বরূপ—প্রত্যেকটি তাঁহার কিছু না কিছু নিকটে পৌঁছাইয়া দেয়। অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ের দ্বারা শাস্ত্রে এই তত্ত্বটি অতি সুন্দর-ভাবে বিবৃত হইয়াছে। অরুন্ধতী অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্র কাহাকেও দেখাইতে হইলে প্রথমে উহার নিকটবর্ত্তী একটি খুব বড় নক্ষত্র দেখাইতে হয়। তাহাতে লক্ষ্য স্থির হইলে তাহার নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্রতর নক্ষত্র—তার পর তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রে লক্ষ্য স্থির হইলে, অতি ক্ষুদ্রতম অরুন্ধতী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর

অরুন্ধতীদর্শন-ন্যায়ে প্রতীক ও প্রতিমা-পূজার উপযোগিতা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা—মূর্ত্তিতে ঈশ্বরারোপ করার উপকারিতা—ঈশ্বরে মূর্ত্তি আরোপের দোষ

হইয়া থাকে। এইরূপে এই সকল বিভিন্ন প্রতীক ও প্রতিমার মানবকে ক্রমে সেই সূক্ষ্ম ঈশ্বরকে লক্ষ্য করাইয়া থাকে। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের উপাসনা—এ সবই প্রতীকোপাসনা। ইহাতে মানবকে প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার সমীপে পঁহুছিয়া দেয় মাত্র, কিন্তু বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের উপাসনায় কোন ব্যক্তির মুক্তি হইতে পারে না, তাঁহাকে উহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যীশুখ্রীষ্টের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ হইয়াছিল, কিন্তু কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে মুক্তিদানে সমর্থ, অবশ্য এমন দার্শনিক লোক আছেন, যাঁহাদের মতে ইহারা প্রতীক নহেন, ইঁহাদিগকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমরা এই সমুদয় সোপানপরম্পরা গ্রহণ করিতে পারি, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যদি এই সব প্রতীকো-পাসনার সময় আমরা মনে করি আমরা ঈশ্বরোপাসনা করিতেছি, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণ ভ্রমে পড়িব। যদি কোন ব্যক্তি যীশু-খ্রীষ্টের উপাসনা করেন ও মনে করেন, তিনি উহা দ্বারাই মুক্ত হইবেন, তিনি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যদি কেহ মনে করে যে ভূত প্রেতের উপাসনা করিয়া বা কোন মূর্ত্তি পূজা করিয়া তাহার মুক্তি হইবে, তবে সে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তবে যদি আপনি মূর্ত্তিটি ভুলিয়া তন্মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পারেন, তবে আপনি যে কোন বস্তুর ভিতর ঈশ্বর দর্শন করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতে পারেন। ঈশ্বরে অন্য কিছু আরোপ করিবেন না, কিন্তু যে কোন বস্তুতে ইচ্ছা ঈশ্বরারোপ করিতে পারেন। একটা বিড়ালের মধ্যে আপনি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন। বিড়ালের বিড়ালত্ব ভুলিতে পারিলেই আর কোন গোল নাই, কারণ তাঁহা হইতেই সমুদয়

আসিয়াছে। তিনিই সব। আমরা একখানি চিত্রকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরকে ঐরূপে উপাসনা করিলে চলিবে না। চিত্রে ঈশ্বরারোপে কোন দোষ নাই, কিন্তু চিত্রকেই ঈশ্বর মনে করায় দোষ আছে। বিড়ালের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন—সে ত খুব ভাল কথা—তাহাতে কোন বিপদাশঙ্কা নাই। কিন্তু বিড়ালরূপী ঈশ্বর প্রতীক মাত্র। প্রথমোক্তটি ভগবানের যথার্থ উপাসনা।

তারপর ভক্তিযোগে প্রধান বিচার্য্য—শব্দশক্তি। আমরা সেদিন আচার্য্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে ভক্তিযোগের অন্তর্গত নামশক্তির আলোচনা করিতে হইবে। সমগ্র জগৎ নামরূপাত্মক। হয় উহা নাম ও রূপের সমষ্টিস্বরূপ অথবা কেবল নাম মাত্র এবং উহার রূপ কেবল একটি মনোময় মূর্ত্তি মাত্র। সুতরাং ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, এমন কিছুই নাই, যাহা নাম রূপাত্মক নহে। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর নিরাকার; কিন্তু যখনই আমরা তাঁহার চিন্তা করিতে যাই, তখনই তাঁহাকে নামরূপযুক্ত ভাবিতে হয়। চিত্ত যেন একটি স্থির হ্রদের তুল্য, চিন্তাসমূহ যেন ঐ চিত্তহ্রদের তরঙ্গস্বরূপ, আর এই সকল তরঙ্গের স্বাভাবিক আবির্ভাব-প্রণালীকেই নামরূপ কহে।

মন্ত্র বা শব্দশক্তির দার্শনিক তত্ত্ব

নামরূপ ব্যতীত কোন তরঙ্গই উঠিতে পারে না। যাহা একরূপ মাত্র, তাহাকে চিন্তা করিতে পারা যায় না। উহা অবশ্যই চিন্তার অতীত বস্তু হইবে, কিন্তু যখনই উহা চিন্তা ও জড়পদার্থের আকার ধারণ করে, তখনই উহার অবশ্যই নামরূপ আসিয়া থাকে।

আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি না। অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বর শব্দ হইতে এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ানগণের যে একটা মত আছে, শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় উহার নামই শব্দব্রহ্মবাদ। উহা একটি প্রাচীন ভারতীয় মত; ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ কর্ত্তৃক ঐ মত, আলেকজান্দ্রিয়ায় নীত হয় এবং তথায় ঐ মত প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে তথায় শব্দব্রহ্মবাদ ও অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঈশ্বর শব্দ হইতে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, একথার গভীর অর্থ আছে। ঈশ্বর যখন স্বয়ং নিরাকার, তখন কিরূপে এই সকল আকৃতির উৎপত্তি হইল, কিরূপে সৃষ্টি হইল, তৎসম্বন্ধে ইহা ব্যতীত আর উত্তম ব্যাখ্যা হইতে পারে না। সৃষ্টি শব্দের অর্থ—বাহির করা—বিস্তার করা। সুতরাং ঈশ্বর শূন্য হইতে জগৎ নির্ম্মাণ করিলেন, এ আহাম্মকি কথার অর্থ কি? জগৎ ঈশ্বর হইতে নির্গত হইয়াছে। তিনিই জগদ্রূপে পরিণত হন, আর সমুদয়ই তাঁহাতে প্রত্যাবৃত্ত হয়, আবার বাহির হয়, আবার প্রত্যাবৃত্ত হয়। অনন্ত কাল ধরিয়া এইরূপ চলিবে। আমরা দেখিয়াছি, আমাদের মন হইতে যে কোন ভাবের সৃষ্টি হয় তাহা নামরূপ ব্যতীত হইতে পারে না। মনে করুন, আপনাদের মন সম্পূর্ণ স্থির রহিয়াছে, উহা সম্পূর্ণ চিন্তাহীন রহিয়াছে। যখনই চিন্তার আরম্ভ হইবে, উহা অমনি নাম ও রূপকে আশ্রয় করিতে থাকিবে। প্রত্যেক চিন্তা বা ভাবেরই একটি নির্দ্দিষ্ট নাম ও একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ আছে। সুতরাং সৃষ্টি বা বিকাশের ব্যাপারটাই অনন্তকাল ধরিয়া নামরূপের সহিত জড়িত। অতএব আমরা দেখিতে পাই, মানুষের

যত প্রকার ভাব আছে অথবা থাকিতে পারে, তাহার প্রতিরূপ একটি নাম বা শব্দ অবশ্যই থাকিবে। তাহাই যদি হইল, তবে যেমন আপনার দেহ আপনার মনের বহির্দ্দেশ বা স্থূল বিকাশ-স্বরূপ, তদ্রূপ এই জগদ্‌ ব্রহ্মাণ্ডও মনেরই বিকাশস্বরূপ, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। আরও ইহা যদি সত্য হয় যে, সমগ্র জগৎ একই নিয়মে গঠিত, তবে যদি আপনি একটি পরমাণুর গঠনপ্রণালী জানিতে পারেন, তবে সমগ্র জগতের গঠনপ্রণালীই জানিতে পারিবেন। আপনাদের নিজেদের শরীরের বাহ্য বা স্থূল ভাগ এই স্থূল দেহ, আর চিন্তা বা ভাব উহারই আভ্যন্তরিক সূক্ষ্মতর ভাগ মাত্র। আপনারা ইহার দৃষ্টান্ত প্রতি-দিনই দেখিতে পাইতে পারেন। কোন ব্যক্তির মস্তিষ্ক যখন বিশৃঙ্খল হয়, তাহার চিন্তা বা ভাবসমূহও অমনি বিশৃঙ্খল হইতে থাকে। কারণ, ঐ দুইটি একই বস্তু—একই বস্তুর স্থূল ও সূক্ষ্মভাগ মাত্র। মন ও ভূত বলিয়া দুইটি পৃথক্ পদার্থ নাই। ৪০ মাইল উচ্চ বায়ুমণ্ডলের কথা ধরুন। এই বায়ুমণ্ডলের যতই ঊর্দ্ধদেশে যাওয়া যায়, ততই উহা সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। এই দেহ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। মন ও দেহ একই বস্তু—একই বস্তু যেন সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবে স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে। দেহটা যেন নখের মত। নখ কাটিয়া ফেলুন, আবার নখ হইবে। বস্তু যতই সূক্ষ্মতর হয়, তাহা ততই অধিক স্থায়ী হয়, সর্ব্বকালেই ইহার সত্যতা দেখা যায়; আবার যতই স্থূলতর হয়, ততই অস্থায়ী হইয়া থাকে। অতএব আমরা দেখিতেছি—রূপ স্থূলতর, নাম সূক্ষ্মতর। ভাব, নাম ও রূপ—এই তিনটি কিন্তু একই বস্তু—একেই তিন, তিনেই এক—একই বস্তুর

ত্রিবিধ রূপ। সূক্ষ্মতর, কিঞ্চিৎ ঘনীভূত ও সম্পূর্ণ ঘনীভূত। একটি থাকিলেই অপরগুলিও থাকিবেই। যেখানে নাম, সেখানেই রূপ ও ভাব বর্ত্তমান। সুতরাং সহজেই ইহা প্রতীত হইতেছে যে, এই দেহ যে নিয়মে নির্ম্মিত, এই ব্রহ্মাণ্ডও যদি সেই একই নিয়মে নির্ম্মিত হয়, তবে ইহাতেও নাম, রূপ ও ভাব এই তিনটি জিনিস অবশ্য থাকিবে। ঐ ভাবই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতম অংশ, উহাই প্রকৃতপক্ষে জগতের সঞ্চালনী শক্তি এবং উহাকেই ঈশ্বর বলে। আমাদের দেহের অন্তরালস্থ ভাবকে আত্মা এবং জগতের অন্তরালস্থ ভাবকে ঈশ্বর বলে। তার পরই নাম, এবং সর্ব্বশেষে রূপ—যাহা আমরা দর্শন স্পর্শন করিয়া থাকি। যেমন আপনি একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, আপনার দেহের একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ আছে, আবার তাহার 'দেবদত্ত' বা 'অনসূয়া' প্রভৃতি স্ত্রীপুংবাচক বিভিন্ন নাম আছে, তাহার পশ্চাতে আবার ভাব অর্থাৎ যে চিন্তা বা ভাবসমষ্টির প্রকাশে এই দেহ নির্ম্মিত—তাহা রহিয়াছে; তদ্রূপ এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে নাম রহিয়াছে—আর সেই নাম হইতেই এই বহির্জ্জগৎ সৃষ্ট বা বহির্গত হইয়াছে। সকল ধর্ম্ম এই নামকে শব্দব্রহ্ম বলিয়া থাকে। বাইবেলে লিখিত আছে,—'আদিতে শব্দ ছিলেন, সেই শব্দ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত ছিলেন, সে শব্দই ঈশ্বর।' সেই নাম হইতে রূপের প্রকাশ হইয়াছে এবং সেই নামের অন্তরালে ঈশ্বর আছেন। এই সর্ব্বব্যাপী ভাব বা জ্ঞানকে সাংখ্যেরা 'মহৎ' আখ্যা প্রদান করেন। এই নাম কি? আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভাবের সঙ্গে নাম অবশ্যই থাকিবে। ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত—আমি ত ইহার ভিতর কোন দোষ

দেখিতে পাই না। সমগ্র জগৎ সমপ্রকৃতিক, আর আধুনিক বিজ্ঞান নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমগ্র জগৎ যে সকল উপাদানে নির্ম্মিত, প্রত্যেক পরামাণুও সেই উপাদানে নির্ম্মিত। আপনারা যদি এক তাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারেন, তবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেই জানিতে পারিবেন! সমগ্র জগৎকে জানিতে হইলে কেবল একটুখানি মাটি লইয়া উহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই হইবে। যদি আপনারা একটি টেবিলকে সম্পূর্ণরূপে—উহার সর্ব্বপ্রকার ভাব লইয়া—জানিতে পারেন, তাহা হইলে আপনারা সমগ্র জগৎটিকে জানিতে পারিবেন। মানুষ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিস্বরূপ—মানুষ স্বয়ংই ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। সুতরাং মানুষের মধ্যে আমরা রূপ দেখিতে পাই, তাহার পশ্চাতে নাম, তৎপশ্চাতে ভাব—অর্থাৎ মননকারী পুরুষ রহিয়াছেন। সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডও অবশ্যই সেই একই নিয়মে নির্ম্মিত হইবে। প্রশ্ন এই, নাম কি? হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দ—ওঁ। প্রাচীন মিশরবাসিগণও তাহাই বিশ্বাস করিত।

'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।'

—যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, আমি সংক্ষেপে তাহাই বলিব—তাহা ওঁ।

'এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥'

—ইনিই অক্ষর অপরব্রহ্ম, ইনিই অক্ষর পরব্রহ্ম। এই অক্ষরের রহস্য জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যাহা বলিবার, বলা হইল। এক্ষণে আমরা জগতের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই ওঙ্কার সমগ্র জগতের সমষ্টিভাব বা ঈশ্বরের নাম। উহা বহির্জ্জগৎ ও ঈশ্বর এই উভয়ের যেন মধ্যভাগে অবস্থিত। উহা উভয়েরই বাচক বা প্রতিনিধিস্বরূপ। কিন্তু সমগ্র জগৎকে সমষ্টিভাবে না ধরিয়াও আমরা জগৎটাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, যথা স্পর্শ, রূপ, রস ইত্যাদি অনুসারে এবং অন্যান্য নানা প্রকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। প্রত্যেক স্থলেই এই ব্রহ্মাণ্ডটিকেই বিভিন্ন দৃষ্টি হইতে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডরূপে দৃষ্টি করা যাইতে পারে, আর এইরূপ বিভিন্ন ভাবে দৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটিই স্বয়ং এক একটি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড হইবে এবং প্রত্যেকটিরই বিভিন্ন নামরূপ ও তাহাদের অন্তরালে একটা ভাব থাকিবে। এই অন্তরালবর্ত্তী ভাবগুলিই এই সব প্রতীক। আর প্রত্যেক প্রতীকের এক একটি নাম আছে। এইরূপ নাম বা পবিত্র শব্দ অনেক আছে; ভক্তিযোগীরা বিভিন্ন নামের সাধন উপদেশ দিয়া থাকেন।

ওঙ্কার ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্র

এই ত নামের দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত হইল—এক্ষণে উহার সাধনে ফল কি, ইহাই বিচার্য্য। এই সব নামের একরূপ অনন্ত শক্তি আছে। কেবল ঐ শব্দগুলির উচ্চারণেই আমরা সমুদয় বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিতে পারি, আমরা সিদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু তাহা হইলেও দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। 'আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা।' গুরুর অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন এবং শিষ্যেরও তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন। এই নাম এমন

নাম সাধনের ফল

ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া চাই, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে উহা পাইয়াছেন। যেন অতি প্রাচীনকাল হইতে গুরু হইতে শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রবাহ আসিতেছে, আর গুরুপরম্পরাক্রমে আসিলেই নাম শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং উহার পুনঃ পুনঃ জপে উহা প্রায় অনন্তশক্তিসম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপ শব্দ বা নাম পাওয়া যায়, তাঁহাকে গুরু, আর যিনি পান, তাঁহাকে শিষ্য বলে। যদি বিধিপূর্ব্বক এইরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া উহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা হয়, তবে আর ভক্তিযোগের কিছু করিবার অবশিষ্ট রহিল না। কেবল ঐ মন্ত্রের বার বার উচ্চারণে ভক্তির উচ্চতর অবস্থা আসিবে।

'নাম্নামকারী বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥'

'হে ভগবন্, আপনার কত নাম রহিয়াছে। আপনি জানেন, উহাদের প্রত্যেকের কি তাৎপর্য্য। সব নামগুলিই আপনার। প্রত্যেক নামেই আপনার অনন্তশক্তি রহিয়াছে। এই সকল নাম উচ্চারণের কোন নির্দ্দিষ্ট দেশকালও নাই—কারণ, সব কালই শুদ্ধ ও সব স্থানই শুদ্ধ। আপনি এত সহজলভ্য, আপনি এত দয়াময়। আমি অতি দুর্ভাগ্য যে, আপনার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিল না।'

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইষ্ট

হিন্দুদের ইষ্টসম্বন্ধীয় মতবাদসম্বন্ধে পূর্ব্ব বক্তৃতায়ই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি—আশা করি, ঐ বিষয়টি আপনারা বিশেষ যত্ন-সহকারে আলোচনা করিবেন ; কারণ, ইষ্টনিষ্ঠা সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বুঝিলে আমরা জগতে বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব। 'ইষ্ট' শব্দটি ইষ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে—উহার অর্থ—ইচ্ছা করা, মনোনীত করা। সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল মানবের চরম লক্ষ্য একই—মুক্তিলাভ ও সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি। যেখানেই কোন প্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান, তথায়ই কোন না কোন আকারে এই মুক্তিবাসনা ও দুঃখনিবৃত্তিরূপ ভাবদ্বয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। অবশ্য, ধর্ম্মের নিম্নাঙ্গসমূহে ঐ ভাব-গুলি তত স্পষ্টরূপে দেখা যায় না বটে, কিন্তু সুস্পষ্ট হউক, আর অস্পষ্টই হউক, আমরা সকলেই ঐ চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমরা সকলেই দুঃখের—প্রতিদিন আমরা যে দুঃখ ভোগ করিতেছি তাহার—হাত এড়াইতে চাই ; আর আমরা সকলেই স্বাধীনতা বা মুক্তিলাভের—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের—চেষ্টা করিতেছি। সমগ্র জগতের সমুদয় কার্য্যের মূলেই ঐ দুঃখনিবৃত্তি ও মুক্তিলাভের চেষ্টা।

সকলের চরম লক্ষ্য এক হইলেও উহাতে পঁহুছিবার উপায় নানা

কিন্তু যদিও সকলের গম্য স্থান এক, তথাপি উহাতে পঁহুছিবার উপায় নানা, আর আমাদের প্রকৃতির বিভিন্নতা ও বিশেষত্ব অনুযায়ী এই সকল বিভিন্ন পথ বা উপায়ের উৎপত্তি হইয়াছে; কাহারও প্রকৃতি ভাবপ্রধান, কাহারও জ্ঞানপ্রধান, কাহারও কর্ম্মপ্রধান, কাহারও বা অন্যরূপ। একপ্রকার প্রকৃতির ভিতরেও আবার অবান্তর ভেদ থাকিতে পারে। এখন আমরা যে বিষয়ের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতেছি, সেই ভক্তি বা ভালবাসার কথাই ধরুন। একজনের প্রকৃতিতে পুত্রবাৎসল্য প্রবল, কাহারও বা স্ত্রীর সহিত অধিক ভালবাসা, কাহারও মাতার প্রতি, কাহারও পিতার প্রতি, কাহারও বা বন্ধুর প্রতি অধিক ভালবাসা বা স্বদেশপ্রীতি অতিশয় প্রবল—আবার কেহ কেহ জাতিধর্ম্মদেশনির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসিয়া থাকেন।

সর্ব্বজনীন প্রেমসম্পন্ন লোক অতি বিরল

অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আর যদিও আমরা সকলেই এমন ভাবে কথা কই, যেন মানবজাতির প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেমই আমাদের জীবনের নিয়ামক, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সমগ্র জগতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি একশত জনের উপর আছেন বলিয়া বোধ হয় না। অল্প কয়েকজন মাত্র সাধুই এই মানবপ্রেম প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন—তাঁহারাই উক্ত শব্দটির সৃষ্টি করিয়াছেন—ক্রমশঃ উহা একটি চলিত শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তার পর আহাম্মকেরাও ঐ শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের মাথায় ত আর কিছু নাই, সুতরাং নিরর্থক তাহারা ঐ শব্দ ব্যবহার

করিয়া থাকে ; অতএব দেখা গেল, মানবজাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক মহাত্মাই সর্ব্বজনীন প্রেম প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন, আর আমার মত লোক তাঁহাদের সেই ভাব লইয়া প্রচার করিয়া থাকে। জগতের সমুদয় মহৎ ভাবগুলিরই পরিণাম এই। তবে আমরা প্রার্থনা করি, কালে এইরূপ অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হইবে, আর তাঁহারা যতই অল্পসংখ্যক হউন, জগৎ যেন কখন একেবারে এরূপ লোকশূন্য না হয়।

যাহা হউক, পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করা যাউক। আমরা দেখিতে পাই, একটি নির্দ্দিষ্ট পথেও সেই ভাবের চরমাবস্থায় যাইবার নানাবিধ উপায় রহিয়াছে। সকল খ্রীষ্টিয়ানগণই খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, কিন্তু

খ্রীষ্টসম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা

প্রত্যেক বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় চার্চ্চ তাঁহাকে বিভিন্ন আলোতে, বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। প্রেস্‌বিটেরিয়ানের * দৃষ্টি খ্রীষ্টের জীবনে সেই অংশে নিবদ্ধ, যে সময়ে তিনি একটি চার্চ্চের ভিতর পোদ্দারদের লেন দেন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে 'তোমরা ভগবানের মন্দির কেন অপবিত্র করিতেছ' বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে অন্যায়ের প্রতি তীব্র আক্রমণকারিরূপে দেখিয়া থাকে।

---

* প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ (Presbyterian)—এই খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বিশপের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া "প্রেস্‌বিটার" নামধারী অধ্যক্ষগণের চার্চ্চের কার্য্য-নিয়মে তুল্য অধিকার স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায় শাসনের (discipline) বিশেষ পক্ষপাতী।

কোয়েকারকে * জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়ত বলিবেন—খ্রীষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। কোয়েকার খ্রীষ্টের ঐ ভাবটি গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার যদি রোম্যান ক্যাথলিককে জিজ্ঞাসা করেন, খ্রীষ্টের জীবনের কোন্ অংশ আপনার খুব ভাল লাগে, তিনি হয়ত বলিবেন, 'যখন তিনি পিটরকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দিয়াছিলেন।' + প্রত্যেক বিভিন্ন সম্প্রদায়ই তাঁহাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য। অতএব দেখা যাইতেছে, এক বিষয়েই কত প্রকার বিভাগ ও অবান্তর বিভাগ থাকে।

---

* কোয়েকার (Quaker)—ইংলণ্ডের লেষ্টার্ সায়র নিবাসী জর্জ্জ ফক্স নামক ব্যক্তি ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে এই ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করেন। ইঁহারা আপনাদিগকে Society of Friends নামে অভিহিত করেন; এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম প্রচারকগণ প্রচারের সময় এতদূর আগ্রহের সহিত শ্রোতৃবৃন্দকে অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপথে যাইতে উপদেশ দিতেন যে, সময়ে সময়ে শ্রোতৃবৃন্দ ভাবে মূর্চ্ছিত হইতেন—অনেকের কম্প হইত। এই 'কম্প' হইতেই এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদিগণ বিদ্রূপচ্ছলে ইঁহাদিগকে Quaker বা কম্পনশীল সম্প্রদায় নামে অভিহিত করে। অসৎপথ হইতে নিবৃত্তির জন্য তীব্র অনুতাপ ও শত্রুর প্রতি সম্পূর্ণ ক্ষমা— এই সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষা।

+ রোম্যান-ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ানগণ বিশ্বাস করেন, যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে পিটরকেই সর্ব্বপ্রধানরূপে মনোনীত করিয়া তাঁহারই উপর সমুদয় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা ও তাহার কার্য্য পরিচালনার প্রধান ভার প্রদান করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস—পিটর রোমের চার্চ্চ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার প্রথম বিশপ হন। আর এই কারণেই তাঁহার পোপ নামধারী উত্তরাধিকারিগণ সমগ্র রোম্যান-ক্যাথলিকগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজার অধিকারী হইয়াছেন। সেণ্ট্ ম্যাথিউ লিখিত গল্পের ১৬শ অধ্যায়, ১৯শ শ্লোকে 'And I will give unto thee the keys of the kingdom of Heaven' ইত্যাদি পিটরের প্রতি যীশুখ্রীষ্টের বাক্যগুলি দেখুন।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সব অবান্তর বিভাগগুলির মধ্যে একটিকে অবলম্বন করিয়া, শুধু যে অপর সকল ব্যক্তির তাহার নিজ ধারণানুসারে জগৎ-সমস্যার ব্যাখ্যা করিবার অধিকার অস্বীকার করে, তাহা নহে, তাহারা—এমন কি, অপরে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং তাহারাই কেবল অভ্রান্ত এই কথাও বলিতে সাহসী হয়। যদি কেহ তাহাদের কথার প্রতিবাদ করে, অমনি তাহারা তাহার সহিত বিরোধে অগ্রসর হয়। তাহারা বলে, তাহারা যাহা বিশ্বাস করে যে কেহ তাহা না মানিবে, তাহাকেই তাহারা মারিয়া ফেলিবে। ইহারাই আবার মনে করে, আমরা অকপট, আর সকলেই ভ্রান্ত ও কপট।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ কেবল আপনাদিগকে অভ্রান্ত ও অপর সকলকে ভ্রান্ত মনে করে

কিন্তু আমরা এই ভক্তিযোগের আলোচনায় কিরূপ ভাব আশ্রয় করিতে চাই? আমরা শুধু অপরে ভ্রান্ত নহে, ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে চাহি না—আমরা সকলকেই বলিতে চাই যে, নিজ নিজ মনোমত পথে যাহারা চলিতেছে, তাহারা সকলেই ঠিক করিতেছে। আপনার প্রকৃতি অনুসারে বাধ্য হইয়া আপনাকে যে পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, আপনার পক্ষে সেই পন্থাই ঠিক। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমাদের অতীত অবস্থার ফলস্বরূপ বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হয় বলুন, উহা আমাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, নয় বলুন, পূর্ব্বপুরুষ হইতে পরম্পরাক্রমে আমরা ঐ প্রকৃতি পাইয়াছি। যে ভাবেই আপনারা উহা নির্দ্দেশ করুন না কেন,

ভক্তিযোগী সকল প্রকার সাধন প্রণালীরই সত্যতা স্বীকার করেন

এই অতীতের প্রভাব আমাদের মধ্যে যেরূপেই আসিয়া থাকুক না কেন, ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, আমরা আমাদের অতীত অবস্থার ফলস্বরূপ। এই কারণেই আমাদের প্রত্যেকেরই ভিতর বিভিন্ন ভাব, প্রত্যেকেরই দেহমনের বিভিন্ন গতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইতে হইবে।

আমাদের প্রত্যেকেই যে বিশেষ পথের, যে বিশেষ সাধন-প্রণালীর উপযোগী, তাহাকেই ইষ্ট কহে। ইহাই ইষ্টবিষয়ক মতবাদ, আর আমরা আমাদের সাধনপ্রণালীকে আমাদের ইষ্ট বলিয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন—কোন ব্যক্তির ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা,—তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বশক্তিমান্ শাসনকর্ত্তা। যাহার ঐরূপ ধারণা, সে স্বভাবতঃই হয়ত ক্ষমতাপ্রিয়—সে হয়ত একজন মহা অহঙ্কারী ব্যক্তি—সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। সে যে ঈশ্বরকে একজন সর্ব্বশক্তিমান শাসনকর্ত্তা ভাবিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অপর একজন—সে হয়ত একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক—কঠোরপ্রকৃতি। সে ভগবান্‌কে ন্যায়-পরায়ণ ঈশ্বর, পুরস্কারশাস্তিবিধাতা ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারে না। প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী দর্শন করিয়া থাকে, আর আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা ঈশ্বরকে যেরূপে দেখিয়া থাকি, তাহাকেই আমাদের ইষ্ট কহে। আমরা আপনাদিগকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছি, যেখানে আমরা ঈশ্বরকে ঐরূপেই, কেবল ঐরূপেই দেখিতে পারি, অন্য

ইষ্ট—প্রকৃতি-ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ঈশ্বর ধারণা

কোনরূপে তাঁহাকে দেখিতে পারি না। আপনি যাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, আপনি অবশ্য তাঁহার উপদেশকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও আপনার ঠিক উপযোগী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি হয়ত আপনার একজন বন্ধুকে যাইয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে বলিবেন—সে শুনিয়া আসিয়া বলিল, ইহা অপেক্ষা কুৎসিত উপদেশ সে আর কখন শুনে নাই। সে মিথ্যা বলে নাই; তাহার সহিত বিবাদ বৃথা। উপদেশে কোন ভুল নাই, কিন্তু উহা সেই ব্যক্তির উপযোগী হয় নাই।

এই বিষয়টিই আর একটু ব্যাপকভাবে বলিলে বলিতে পারা যায়, একটা সত্য—সত্যও বটে, আবার মিথ্যাও বটে। আপাততঃ কথা দুইটি বিরোধিবৎ প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে, নিরপেক্ষ সত্য একমাত্র বটে, কিন্তু আপেক্ষিক সত্য নানা। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই জগতের কথাই ধরুন। এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড নিরপেক্ষ সমষ্টিবস্তু হিসাবে অপরিবর্ত্তনশীল, সমরস সত্তা মাত্র, কিন্তু আপনি, আমি, আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের পৃথক্ পৃথক্ জগৎ দেখিয়া ও শুনিয়া থাকি। অথবা সূর্য্যের কথা ধরুন। সূর্য্য একমাত্র, কিন্তু আপনি, আমি এবং অন্যান্য শত শত ব্যক্তি উহাকে বিভিন্ন সূর্য্যরূপে দেখিব। আমাদিগের প্রত্যেককেই সূর্য্যকে বিভিন্ন ভাবে দেখিতে হইবে। একটুকু স্থানপরিবর্ত্তন করিলে এক ব্যক্তিই পূর্ব্বে সূর্য্যকে যেরূপ দেখিয়াছিল, এখন আর একরূপ দেখিবে। বায়ুমণ্ডলে এতটুকু পরিবর্ত্তন হইলে সূর্য্যকে আর একরূপ দেখাইবে। সুতরাং বুঝা

নিরপেক্ষ সত্য এক হইলেও আপেক্ষিক সত্য নানা

গেল, আপেক্ষিক জ্ঞানে সত্য সর্ব্বদাই বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। নিরপেক্ষ সত্য কিন্তু একমাত্র। এই হেতু যখন দেখিতে পাইবেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে সকল কথা বলিতেছে, তাহার সহিত আপনার মত ঠিক মিলিতেছে না, তখন তাহার সহিত আপনার বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, আপাততঃ বিরুদ্ধ প্রতীয়মান হইলেও আপনাদের উভয়ের মতই সত্য হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন ব্যাসার্দ্ধ এক সূর্য্যের কেন্দ্রাভিমুখে গিয়াছে। কেন্দ্র হইতে যত দূরবর্ত্তী হয়, দুইটি ব্যাসার্দ্ধের দূরত্বও তত অধিক হয়; কেন্দ্রের যত সমীপবর্ত্তী হয়, দূরত্ব ততই অল্প হয়; আর যখন সমুদয় ব্যাসার্দ্ধগুলি কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়, তখন দূরত্ব একেবারে তিরোহিত হয়। এই কেন্দ্রই সমুদয় মানবজাতির চরম লক্ষ্য। ঐ কেন্দ্র ত রহিয়াছেই —কিন্তু উহা হইতে এই যে সব ব্যাসার্দ্ধ শাখাপ্রশাখারূপে বহির্গত হইয়াছে, সেগুলি আমাদের প্রকৃতিগত বাধা বা আবরণস্বরূপ, যাহার মধ্য দিয়াই আমাদের পক্ষে উহার কোনরূপ দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে—আর এই প্রকৃতিগত বাধারূপ ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগকে অবশ্যই এই নিরপেক্ষ সত্যকে বিভিন্নভাবে দেখিতে হইবে। এই কারণে আমাদের কেহই অঠিক নহে, সুতরাং কাহারো অপরের সহিত বিবাদের প্রয়োজন নাই।

ইহার একমাত্র মীমাংসা—সেই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া। আমাদের মধ্যে শত শত ব্যক্তির প্রত্যেকের বিভিন্ন মত। এখন আমরা যদি সকলে মিলিয়া বসিয়া তর্কযুক্তি বা বিবাদের দ্বারা

আমাদের বিভিন্নতার মীমাংসার চেষ্টা করি, তাহা হইলে শত শত বর্ষেও আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইব না। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। ইহার একমাত্র মীমাংসা—অগ্রসর হওয়া—সেই কেন্দ্রের দিকে যাওয়া—আর শীঘ্র শীঘ্র উহা করিতে পারিলে অতি সত্বরেই আমাদের বিরোধ বা বিভিন্নতা নাশ হইয়া যাইবে।

বিরোধভঞ্জনের প্রকৃত উপায়— সেই নিরপেক্ষ সত্যের উপলব্ধি

অতএব ইষ্টনিষ্ঠা অর্থে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ ধর্ম্ম নির্ব্বাচন করিতে অধিকার দেওয়া। আমি যাঁহার উপাসনা করি, আপনি তাঁহাকে উপাসনা করিতে পারেন না, অথবা আপনি যাঁহাকে উপাসনা করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করিতে পারি না। ইহা অসম্ভব। আর এই যে সব চেষ্টা— কতকগুলা লোককে জড় করিয়া 'চাপেন শাপেন বা,' জোরজার করিয়া – অধিকারী বিচার নাই— কিছু নাই—যাহাকে তাহাকে ধরিয়া এক বেড়ার মধ্যে পূরিয়া এক প্রকারে ঈশ্বরোপাসনা করাইবার চেষ্টা—কখন সফল হয় নাই, কোন কালে সফল হইতেই পারে না; কারণ, ইহা যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অসম্ভব চেষ্টা। শুধু তাহাই নয়, ইহাতে মানুষের একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এমন নরনারী একটিও দেখিতে পাইবেন না, যে কিছু না কিছু ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা না করিতেছে—কিন্তু কটা লোক ধর্ম্ম লাভ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে? খুব কম লোকেই বাস্তবিক ধর্ম্ম বলিয়া কিছু লাভ করিয়াছে; কেন বলুন দেখি?—কারণ, যাহা হইবার নয়, তাহার

দল বাঁধিয়া ধর্ম্মলাভ হয় না

জন্য লোকে চেষ্টা করিতেছে। অপরের হুকুমে জোর করিয়া তাহাকে একটা ধর্ম্ম অবলম্বন করান হইয়াছে।

জোর করিয়া একজনের ভাব অপরের ভিতর প্রবেশ করানর চেষ্টার ঘোরতর কুফল

মনে করুন, আমি একটি ছোট ছেলে। আমার বাবা একখানি ছোট বই আমার হাতে দিয়া বলিলেন—ঈশ্বর এই রকম, অমুক জিনিস এই এই রকম। কেন, আমার মনে ঐ সব ভাব ঢুকাইয়া দিবার তাঁহার কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল? আমি কি ভাবে উন্নতি লাভ করিব, তাহা তিনি কিরূপে জানিলেন? আমার প্রকৃতি অনুসারে আমি কিরূপে উন্নতি লাভ করিব, তাহার কিছু না জানিয়া তিনি আমার মাথায় তাঁহার ভাবগুলি জোর করিয়া ঢুকাইবার চেষ্টা করেন—আর তাহার ফল এই হয় যে, আমার উন্নতি—আমার মনের বিকাশ—কিছুই হয় না। আপনারা একটি গাছকে কখন শূন্যের উপর অথবা উহার পক্ষে অনুপযোগী মৃত্তিকার উপর বসাইয়া ফলাইতে পারেন না। যে দিন আপনারা শূন্যের উপর গাছ জন্মাইতে সক্ষম হইবেন সেই দিন আপনারা একটা ছেলেকেও তাহার প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া জোর করিয়া আপনাদের ভাব শিখাইতে পারিবেন।

ছেলে নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে। তবে আপনারা তাহাকে তাহার নিজের ভাবে উন্নতি করিতে সাহায্য করিতে পারেন। আপনারা তাহাকে সাক্ষাৎভাবে কিছু দিয়া সাহায্য করিতে পারেন না, তাহার উন্নতির বিঘ্ন দূর করিয়া 'নেতি' মার্গে সাহায্য করিতে পারেন। জ্ঞান স্বয়ংই তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মাটিটা একটু খুঁড়িয়া দিতে পারেন, যাহাতে অঙ্কুর সহজে বাহির হইতে পারে; উহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিয়া দিতে পারেন; এইটুকু দেখিতে পারেন যে, অতিরিক্ত হিমে বর্ষায় যেন উহা একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়—ব্যস্, আপনার কার্য্য ঐখানেই শেষ। উহার বেশী আপনি আর কিছু করিতে পারেন না। উহা নিজ প্রকৃতিবশেই সূক্ষ্ম বীজ হইতে স্থূল বৃক্ষাকারে প্রকাশ হইয়া থাকে। ছেলেদের শিক্ষা সম্বন্ধেও এইরূপ। ছেলে নিজে নিজেই শিক্ষা পাইয়া থাকে। আপনারা আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন, যাহা শিখিলেন, বাটী গিয়া নিজ মনের চিন্তা ও ভাবগুলির সহিত মিলাইয়া দেখুন দেখি, দেখিবেন, আপনারাও চিন্তা করিয়া ঠিক সেই ভাবে—সেই সিদ্ধান্তে—পঁহুছিয়াছিলেন, আমি কেবল সেইগুলি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র। আমি কোন কালে আপনাদিগকে কিছু শিখাইতে পারি না। আপনাদিগকে নিজেদের শিক্ষা নিজেই করিতে হইবে—হয়ত আমি সেই চিন্তা, সেই ভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া আপনাদিগকে একটু সাহায্য করিতে পারি। ধর্ম্মরাজ্যে একথা আরো সত্য। ধর্ম্ম নিজে নিজেই শিখিতে হইবে।

অপরকে যথার্থ সাহায্য করিবার প্রকৃত উপায়—তাহার উন্নতির বাধাগুলি অপসারিত করিয়া দেওয়া

আমার মাথায় কতকগুলো বাজে ভাব ঢুকাইয়া দিবার আমার পিতার কি অধিকার আছে? আমার প্রভুর এই সব ভাব আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার আছে? এসব জিনিস আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার সমাজের কি অধিকার আছে? হইতে

পারে ওগুলি ভাল ভাব, কিন্তু আমার রাস্তা ও না হইতে পারে।

কাহারও কাহাকেও নিজ ভাব জোর করিয়া দিবার অধিকার নাই—উহার ঘোরতর কুফল

লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশুকে এইরূপে নষ্ট করা হইতেছে—জগতে আজ কি ভয়ানক অমঙ্গল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে, ভাবুন দেখি! কত কত সুন্দর ভাব, যাহা অদ্ভুত আধ্যাত্মিক সত্য হইয়া দাঁড়াইত—সেগুলি বংশগত ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম, জাতীয় ধর্ম্ম প্রভৃতি ভয়ানক ধারণাগুলি দ্বারা অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভাবুন দেখি! এখনও আপনাদের মস্তিষ্কে আপনাদের বাল্যকালের ধর্ম্ম, আপনাদের দেশের ধর্ম্ম—এই সব লইয়া কি ঘোর কুসংস্কাররাশি রহিয়াছে, ভাবুন দেখি! ঐ সকল কুসংস্কার শুধু আপনাদিগকেই প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা নহে, আপনারা আবার সেইগুলি দিয়া আপনাদের ছেলেমেয়েকে নষ্ট করিতে উদ্যত রহিয়াছেন। মানুষ অপরের কতটা অনিষ্ট করিয়া থাকে ও করিতে পারে, তাহা সে জানে না। জানে না—সে একরূপ ভালই বলিতে হইবে; কারণ, একবার যদি সে তাহা বুঝিত, তবে সে তখনই আত্মহত্যা করিত। প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কার্য্যের অন্তরালে কি প্রবল শক্তি রহিয়াছে, তাহা সে জানে না। এই প্রাচীন উক্তিটি সম্পূর্ণ সত্য যে, "দেবতারা যেখানে যাইতে সাহস করেন না, নির্ব্বোধেরা সেখানে বেগে অগ্রসর হয়।" গোড়া হইতেই এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। কিরূপে? 'ইষ্টনিষ্ঠা' মতে বিশ্বাসী হইয়া। নানাপ্রকার আদর্শ রহিয়াছে। আপনার কি আদর্শ হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার অধিকার

নাই—জোর করিয়া কোন আদর্শ আপনাকে দিবার আমার অধিকার নাই। আমার কর্ত্তব্য—আপনার সাম্‌নে এই সব আদর্শ ধরা—যাহাতে কোন্‌টা আপনার ভাল লাগে, কোন্‌টা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, কোন্‌টা আপনার প্রকৃতিসঙ্গত, সেইটি আপনি দেখিতে পান। যে কোনটি হয় গ্রহণ করুন, আর সেই আদর্শ লইয়া ধৈর্য্যের সহিত সাধন করিয়া যান—আর এই যে আদর্শটি আপনি গ্রহণ করিলেন, সেইটি আপনার ইষ্ট হইল, আপনার বিশেষ আদর্শ হইল।

অতএব আমরা দেখিতেছি, দল বাঁধিয়া কখন ধর্ম্ম হইতে পারে না। আসল ধর্ম্ম প্রত্যেকের নিজের নিজের কাজ। আমার নিজের একটা ভাব আছে—আমাকে উহাকে পরম পবিত্রজ্ঞানে গোপনে নিজ হৃদয়ের ভিতর রাখিতে হইবে; কারণ আমি জানি, আপনার ওভাব না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সকলকে আমার ভাব বলিয়া বেড়াইয়া তাহাদের অশান্তি উৎপাদন করিয়া কি হইবে? লোককে আমার ভাব বলিয়া বেড়াইলে তাহারা আমার সহিত আসিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে। জগৎ কতকগুলি পাগল ও আহাম্মকে পূর্ণ। কখন কখন আমার মনে হয়, জগৎটা একটা পাগলা গারদ—ভগবানের চিড়িয়াখানা। আমার ভাব তাহাদের নিকট প্রকাশ না করিলে তাহারা আমার সহিত বিরাদ করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি আমার ভাব এইরূপে বলিয়া বেড়াইতে থাকি, তবে সকলেই আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। অতএব বলিয়া ফল কি? এই ইষ্ট প্রত্যেকেরই গোপন থাকা উচিত—

প্রত্যেকের ইষ্ট প্রত্যেকের প্রাণের বস্তু ও গোপন থাকা উচিত

আপনার নিজের ব্যাপার অপরের জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। উহা আপনি জানিবেন আর আপনার ভগবান্ জানিবেন। ধর্ম্মের তাত্ত্বিক ভাব বা মতবাদগুলি সর্ব্বসাধারণে প্রচার করা যাইতে পারে, সর্ব্ববিধ জনগণের সমক্ষে উহা প্রচার করা যাইতে পারে, কিন্তু সাধনাঙ্গ সর্ব্বসাধারণে প্রচার করা যাইতে পারে না; হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরিত কর বলিলেই কি ফস্ করিয়া কেহ উহা করিতে পারে?

সমবেত হইয়া ধর্ম্মকরারূপ এই তামাসার প্রয়োজন কি? এ ধর্ম্মকে লইয়া ঠাট্টা করা—ঘোর নাস্তিকতা মাত্র। এই কারণেই গীর্জ্জাগুলি ভদ্রমহিলাদের ভাল ভাল পোশাক পরিয়া বাহার দিবার জায়গা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গীর্জ্জা এখন ধর্ম্ম-বিবাহের স্থান না হইয়া বিবাহের পূর্ব্বে যাইয়া বাহার দিবার জায়গা হইয়া উঠিয়াছে! মানবপ্রকৃতি কত আর এই নিয়মের বন্ধন সহ্য করিবে? এখনকার গীর্জ্জার ধর্ম্ম সেনাবাসে সৈন্যগণের কস্‌রতের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাত তোল, হাঁটু গাড়, বই হাতে কর—সব ধরা বাঁধা। দুমিনিট ভক্তি, দুমিনিট জ্ঞান বিচার, দুমিনিট প্রার্থনা—সব পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা। এ অতি ভয়াবহ ব্যাপার—গোড়া থেকেই এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। এ সব ধর্ম্মের হাস্যাস্পদ বিকৃত অনুকরণ এখন আসল ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে; আর যদি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ চলে, তবে ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে। তখন আর গীর্জ্জায় থাকিবে কি? গীর্জ্জাসকল যত খুশি মতামত, দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করুক না কেন, কিন্তু

আধুনিক গির্জ্জার ধর্ম্ম

উপাসনার সময় আসিলে, আসল সাধনার সময় আসিলে, যেমন যীশু বলিয়াছেন, "প্রার্থনার সময় আসিলে নিজগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাও, এবং সেই গূঢ়ভাবে অবস্থিত তোমার পিতার নিকট প্রার্থনা কর," তদ্রূপ করিতে হইবে।

ইহার নাম ইষ্টনিষ্ঠা। আপনারা ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন, প্রত্যেককে যদি নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়, যদি অপরের সহিত বিবাদ এড়াইতে হয় ও যদি আধ্যাত্মিক জীবনে যথার্থ উন্নতিলাভ করিতে হয়, তবে দেখিবেন—এই ইষ্টনিষ্ঠাই ইহার একমাত্র উপায়। তবে আমি আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে আপনারা যেন আমার কথার অর্থ এরূপ ভুল বুঝিবেন না যে, আমি গুপ্তসমিতি গঠনের সমর্থন করিতেছি। যদি সয়তান কোথাও থাকে, তবে আমি গুপ্তসমিতিসমূহের ভিতর তাহাকে খুঁজিব। গুপ্তসমিতি—এ সব পৈশাচিক ব্যাপার।

ইষ্ট গোপনীয় বলিয়া আমি গুপ্তসমিতি গঠনের পক্ষপাতী নহি

ইষ্ট প্রকৃতপক্ষে কিছু গুপ্ত ব্যাপার নহে, উহা পরম পবিত্র বলিয়া আমাদের প্রাণের বস্তু। অপরের নিকট আপনার ইষ্টের বিষয় কেন বলিবেন না? না—আপনার প্রাণের বস্তু বলিয়া উহা আপনার নিকট পরম পবিত্র। উহার দ্বারা অপরের সাহায্য হইতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা যে অপরের অনিষ্ট হইবে না, তাহা আমি কি করিয়া জানিব? মনে করুন, কোন ব্যক্তির প্রকৃতিই এইরূপ যে, সে ব্যক্তিবিশেষ বা সগুণ ঈশ্বরের উপাসনায় অসমর্থ—সে কেবল নির্গুণ ঈশ্বরের—নিজ উচ্চতম স্বরূপের—উপাসনায় সমর্থ। মনে করুন, আমি তাহাকে আপনাদের মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম,

আর সে বলিতে লাগিল—একজন নির্দ্দিষ্ট পুরুষস্বরূপ ঈশ্বর কেহ নাই, তুমি আমি সকলেই ঈশ্বর। আপনারা ইহাতে প্রাণে আঘাত পাইবেন—চমকিয়া উঠিবেন। তাহার ঐ ভাব তাহার প্রাণের বস্তু বলিয়া তাহার নিকট পরম পবিত্র বটে, কিন্তু উহা কিছু গুপ্ত ব্যাপার নহে।

ইষ্ট গোপন রাখার তাৎপর্য্য

কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বা শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ঈশ্বরের সত্য প্রচারের জন্য কখন গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ভারতে এরূপ কোন গুপ্তসমিতি নাই, এ সব পাশ্চাত্য ভাব—ঐগুলি এখন ভারতের উপর চাপাইবার চেষ্টা হইতেছে! আমরা এ সব গুপ্তসমিতি সম্বন্ধে কোন কালে কিছু জানিতাম না, আর ভারতে এই গুপ্তসমিতি থাকিবার প্রয়োজনই বা কি? ইউরোপে কোন ব্যক্তিকে চার্চ্চের মতের বিরুদ্ধ একটা কথা বলিতে দেওয়া হইত না। সেই কারণে এই গরীব বেচারারা যাহাতে নিজেদের মনোমত উপাসনা করিতে পারে, তজ্জন্য পাহাড়ে গিয়া লুকাইয়া গুপ্তসমিতি গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতে কিন্তু বিভিন্নধর্ম্মমতাবলম্বী হওয়ার দরুণ কেহ কখনও কাহারও উপর অত্যাচার করে নাই। ইউরোপীয়েরা ভারতে যাইবার পূর্ব্বে তথায় কোন কালে কখনও গুপ্ত ধর্ম্মসমিতি ছিল না, সুতরাং ঐরূপ সব ধারণা আপনারা একেবারেই ছাড়িয়া দিবেন। উহা অপেক্ষা ভয়াবহ ব্যাপার আর কল্পনায় আনিতে পারা যায় না—সহজেই ঐ সব সমিতির ভিতর গলদ ঢুকিয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। আমার জগতের যতটুকু অভিজ্ঞতা

ভারতে কোন কালে গুপ্ত সমিতি ছিল না

আছে, তাহাতেই আমি জানি, এই সব গুপ্ত সমিতির আসল তাৎপর্য্যটা কি—কত সহজে উহারা বাধাহীন প্রেম-সমিতি, ভূতুড়ে-সমিতিরূপে দাঁড়ায়। লোকে উহাতে আসে, আপনার মনের মানুষ খুঁজিতে—লোকে শপথ করিয়া নিজেদের জীবনটা এবং ভবিষ্যতে তাহাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে এবং অপর নরনারীর হাতের পুতুল হইয়া দাঁড়ায়। আমি এই সব বলিতেছি বলিয়া আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু আমাকে সত্য বলিতে হইবে। আমার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত হয়ত পাঁচ সাত জন লোক আমার কথা শুনিয়া চলিবে—কিন্তু এই পাঁচ সাত জন যেন পবিত্র, অকপট ও খাঁটি লোক হয়। আমি কতকগুলা বাজে ঝামেলা চাহি না। কতকগুলা লোক জড় হইয়া কি করিবে? মুষ্টিমেয় গোটাকতক লোকের দ্বারাই জগতের ইতিহাস গঠিত হইয়াছে—অবশিষ্টগুলি ত গড্ডলিকাপ্রবাহ মাত্র। এই সমস্ত গুপ্তসমিতি ও বুজরুকি নরনারীকে অপবিত্র, দুর্ব্বল ও সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে; আর দুর্ব্বল ব্যক্তির দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি নাই, সুতরাং সে কখন কোন কাযই করিতে পারে না। অতএব ওগুলির দিকেই যাইবেন না। ও সব হৃদয়ের ভিতরকার কাম বা ভ্রান্ত রহস্যপ্রিয়তা মাত্র! আপনাদের মনে ঐ সব ভাব উদয় হইবামাত্র তখনই একেবারে উহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। যে এতটুকু অপবিত্র, সে কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না। পচা ঘাকে ফুল চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন না। আপনারা কি ভাবেন, আপনারা ভগবান্‌কে ঠকাইতে পারিবেন? কেহই কখন

গুপ্ত সমিতির ভিতরকার গলদ

পারে না। আমি সাদাসিদে সরলপ্রকৃতি নরনারী চাই; আর ঈশ্বর আমাকে এই সব ভূত, উড্ডীয়মান দেবতা ও ভূগর্ভোত্থিত অসুর হইতে রক্ষা করুন। সাদাসিদে ভাল লোক হউন। যখনই লোক এইসব অলৌকিক দাবী করে, তখনই এই কথাগুলি স্মরণ করিবেন।

সহজাত সংস্কার, বিচারজনিত জ্ঞান ও দিব্যজ্ঞান

অন্যান্য প্রাণীর মত আমাদের ভিতরেও সহজাত সংস্কার বিদ্যমান—দেহের যে সকল ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে আপনা আপনি হইয়া যায় সেইগুলি ইহার উদাহরণ। ইহা হইতে আমাদের আর এক উচ্চতর বৃত্তি আছে—তাহাকে বিচার-বুদ্ধি বলা যায়। যখন বুদ্ধি নানাবিধ বিষয় গ্রহণ করিয়া সেইগুলি হইতেই একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহাকেই বিচারবুদ্ধি বলে। ইহা অপেক্ষা জ্ঞানলাভের আর এক উচ্চতর প্রণালী আছে—তাহাকে প্রাতিভ-জ্ঞান বলে। উহাতে আর যুক্তিবিচারের প্রয়োজন হয় না—উহাতে সহসা হৃদয়ে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাই জ্ঞানের উচ্চতম অবস্থা। কিন্তু সহজাত সংস্কার হইতে ইহার প্রভেদ কিরূপে বুঝিতে পারা যায়? ইহাই মুশ্‌কিল। আজকাল অতি আহাম্মকেরা আপনার নিকট আসিয়া বলিবে, আমি প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাহারা বলে, "আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি—আমার জন্যে একটা বেদী করিয়া দাও, আমার কাছে আসিয়া সব জড় হও, আমার পূজা কর।"

কেহ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছে বা জুয়াচুরি করিতেছে, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? দিব্যজ্ঞানের প্রথম পরীক্ষা এই যে, উহা

কখনই যুক্তিবিরোধী হইবে না। বৃদ্ধাবস্থা শৈশবাবস্থার বিরোধী নহে, উহার বিকাশমাত্র ; এইরূপ আমরা যাহাকে প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান বলি, তাহা যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞানের বিকাশমাত্র। যুক্তিবিচারের ভিতর দিয়াই দিব্য-জ্ঞানে পঁহুছিতে হয়। দিব্যজ্ঞান কখনই যুক্তির বিরোধী হইবে না—যদি হয়, তবে উহাকে টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিন। আপনার অজ্ঞাতে দেহের যে সকল গতি হয় সেগুলি ত যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। একটা রাস্তা পার হইবার সময় গাড়ী চাপা যাহাতে না পড়িতে হয়, তজ্জন্য অসাড়ে আপনার দেহের কেমন গতি হইয়া থাকে। আপনার মন কি বলে, দেহকে এরূপে রক্ষা করাটা নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়াছে? কখনই বলে না। খাঁটি দিব্যজ্ঞান কখন যুক্তির বিরোধী হয় না। যদি হয়, তবে উহা আগাগোড়া জুয়াচুরি বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই দিব্যজ্ঞান সকলের পক্ষে কল্যাণকর হওয়া চাই। উহাতে লোকের উপকারই হইবে, নাম যশ বা কোন বদমায়েসের পকেট ভর্ত্তি করা যেন উহার উদ্দেশ্য না হয়। সর্ব্বদাই উহা দ্বারা জগতের—সমগ্র মানবের—কল্যাণই হইবে। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইবে। যদি এই দুইটি লক্ষণ মিলে, তবে আপনি অনায়াসে উহাকে দিব্য বা প্রাতিভজ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় লক্ষে এক জনের এইরূপ দিব্যজ্ঞান লাভ হয় কি না সন্দেহ। আমি আশা করি, এইরূপ লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে, আর আপনারা প্রত্যেকেই এইরূপ দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন। এখন ত আমরা

দিব্যজ্ঞানের লক্ষণ

ধর্ম্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছি মাত্র, এই দিব্যজ্ঞান হইলেই আমাদের ধর্ম্ম যথার্থ আরম্ভ হইবে। সেণ্ট্ পল যেমন বলিয়াছিলেন,—"এক্ষণে আমরা অস্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া অস্পষ্টভাবে দেখিতেছি, কিন্তু তখন সাম্না সাম্নি দেখিব।" জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

দিব্যজ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত ধর্ম্মলাভ অসম্ভব

কিন্তু এখন যেরূপ জগতে 'আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি' বলিয়া দাবী শুনা যায়, আর কখনই এরূপ শুনা যায় নাই, আর এই যুক্তরাজ্যে এইরূপ দাবী যত দেখা যায়, আর কোথাও তত নহে। এখানকার লোকে বলিয়া থাকে, রমণীগণ সব দিব্যজ্ঞানসম্পন্না, আর পুরুষেরা যুক্তিবিচারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতেছে। এ সব বাজে কথায় বিশ্বাস করিবেন না। দিব্যজ্ঞান-সম্পন্না স্ত্রীলোক অপেক্ষা ঐরূপ পুরুষের সংখ্যা কখনই কম নহে। অবশ্য স্ত্রীলোকদের এইটুকু বিশেষত্ব যে, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রকার মূর্চ্ছা ও স্নায়বীয় রোগ প্রবল। জুয়াচোর ঠকের কাছে ঠকা অপেক্ষা ঘোর অবিশ্বাসী থাকিয়া মরাও ভাল। বিধাতা আপনাকে অল্প স্বল্প তর্কবিচারশক্তি দিয়াছেন—দেখান, আপনি উহার যথার্থ ব্যবহার করিয়াছেন। তার পর উহা অপেক্ষা উচ্চ উচ্চ বিষয়ে হাত দিবেন।

দিব্যজ্ঞানের অনর্থক দাবী

আমার সহিত একবার একজন দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুর সাক্ষাৎ হয়,—সে এদিকে বেশ সুশিক্ষিত, কিন্তু হিমালয়বাসী অদ্ভুত-শক্তিশালী মহাত্মাদের গল্প শুনিয়া তাহার মাথা বিগড়াইয়া

গিয়াছিল। আমি যখন বলিলাম, ও সব মহাত্মাদের বিষয় আমি কিছুই জানি না এবং সম্ভবতঃ ওসব গল্পের ভিতর কিছু সত্য নাই, তখন সে ব্যক্তি আমার উপর ভয়ানক চটিয়া গেল এবং আমাকে একজন জুয়াচোর ঠাওরাইল।

জগতের ভাবই এই, আর এই সব নির্ব্বোধ যখন আপনাদিগের নিকট এইরূপ একটা গল্প করিবে, তখন তাহাদের নিকট উহা অপেক্ষা আর একটু রঙ্গদার গল্প করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। এই রহস্যপ্রিয়তা একটা ব্যারাম—এক প্রকার অস্বাভাবিক বাসনা। উহাতে সমগ্র জাতিকে হীনবীর্য্য করিয়া দেয়, স্নায়ু ও মস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া দেয়—সদা সর্ব্বদা একটা অস্বাভাবিক ভূতের ভয় বা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য পিপাসা বাড়াইয়া দেয়। এই সব বিকট গল্পগুলিতে স্নায়ুমণ্ডলীকে অস্বাভাবিকরূপে বিকৃত করিয়া রাখে। ইহাতে সমগ্র জাতি ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে হীনবীর্য্য হইয়া যায়।

অদ্ভুত ব্যাপারের অনুসন্ধানে মানুষকে হীনবীর্য্য করিয়া ফেলে

আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ—তিনি এ সব অদ্ভুত ব্যাপারের ভিতর নাই। 'উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।'—মূর্খ সে, যে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য একটা কূয়া খুঁড়িতে যায়। মূর্খ সে, যে হীরার খনির নিকট থাকিয়া কাচখণ্ডের অন্বেষণে জীবন অতিবাহিত করে। ঈশ্বরই সেই হীরক-খনি। আমরা ভূতের গল্প ও এইরূপ সমুদয় বৃথা বস্তুর প্রতি আসক্ত হইয়া ভগবান্‌কে ত্যাগ করিতেছি—ইহা যে মূর্খতা—তাহাতে আর সন্দেহ কি? উহাতে মানুষকে

হীনবীর্য্য করিয়া দেয়—ওসব সম্বন্ধে কথা কহাই মহাপাপ! ঈশ্বর, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা—এ সব ছাড়িয়া এই সব বৃথা বিষয়ের দিকে ধাবমান হওয়া! অপরের মনের ভাব জানা! পাঁচ মিনিট যদি আমাকে অপর লোকের মনের ভাব জানিতে হয়, তাহা হইলে ত আমি পাগল হইয়া যাইব। তেজস্বী হউন, নিজের পায়ের উপর খাড়া হইয়া দাঁড়ান, প্রেমের ভগবান্‌কে অন্বেষণ করুন। ইহাই মহাতেজের—মহাবীর্য্যের নিদান। পবিত্রতার শক্তি হইতে আর কোন্ শক্তি শ্রেষ্ঠ? প্রেম ও পবিত্রতাই জগৎ শাসন করিতেছে। দুর্ব্বল ব্যক্তি কখন এই ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে পারে না—অতএব শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক কোন দিকে দুর্ব্বল হইবেন না। ঐ সব ভূতুড়ে কাণ্ডে কেবল আপনাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে—অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য—আর সব অসত্য। ঈশ্বর ব্যতীত আর সমুদয় মিথ্যা—সব মিথ্যা। ঈশ্বরের, কেবল ঈশ্বরের সেবা করুন।

আসল বস্তু ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অদ্ভুত তত্ত্বের অনুসন্ধানে জীবন নষ্ট করিবেন না

সপ্তম অধ্যায়

গৌণী ও পরা ভক্তি

দুই একটি ছাড়া সকল ধর্ম্মেই ব্যক্তিবিশেষ বা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম ব্যতীত বোধ হয় জগতের সকল ধর্ম্মই সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকে, আর সগুণ ঈশ্বর মানিলেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি উপাসনাদি ভাব আসিয়া থাকে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা যদিও সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যেভাবে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে, ইহারাও ঠিক সেই ভাবে স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণের পূজা করিয়া থাকে। এই ভক্তি ও উপাসনার ভাব, যাহাতে আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর পুরুষবিশেষকে ভালবাসিতে হয় এবং যিনি আবার আমাদিগকে ভালবাসিয়া থাকেন—উহা সার্ব্বজনীন। বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরে এই ভক্তি ও উপাসনার ভাব বিভিন্ন পরিমাণে পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌণী ভক্তি—স্থূলসহায়ে সূক্ষ্মধারণার চেষ্টা

সাধনের সর্ব্বনিম্ন স্তর বা সোপান বাহ্য অনুষ্ঠানাত্মক—ঐ অবস্থায় সূক্ষ্মধারণা একরূপ অসম্ভব—সুতরাং তখন সূক্ষ্ম ভাবগুলিকে নিম্নতম স্তরে টানিয়া আনিয়া স্থূল আকারে পরিণত করা হয়। ঐ অবস্থায় নানাবিধ অনুষ্ঠান ক্রিয়াপদ্ধতি প্রভৃতি আসিয়া থাকে—সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ প্রতীকও আসিয়া থাকে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানব প্রতীক বা বিভিন্ন

ভাবপ্রকাশক আকৃতিবিশেষের সহায়তায় সূক্ষ্মকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্মের বাহ্য অঙ্গস্বরূপ ঘণ্টা, সঙ্গীত, শাস্ত্র, প্রতিমা, অনুষ্ঠান—এ সবগুলিই ঐ পর্য্যায়ভুক্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে কোন বস্তু মানুষকে সূক্ষ্মের স্থূল আকার দিবার সহায়তা করে, তাহাই লইয়া উপাসনা করা হয়।

সময়ে সময়ে সকল ধর্ম্মেই সংস্কারকগণের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান ও প্রতীকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই; কারণ মানুষ যতদিন বর্ত্তমান অবস্থাপন্ন থাকিবে, ততদিন অধিকাংশ মানবই এমন কিছু স্থূল বস্তু চাহিবে, যাহা তাহাদের ভাবরাশির আধারস্বরূপ হইতে পারে—এমন কিছু চাহিবে, যাহা তাহাদের অন্তরস্থ ভাবময়ী মূর্ত্তিগুলির কেন্দ্রস্বরূপ হইবে। মুসলমান ও প্রটেষ্ট্যাণ্টেরা সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানপদ্ধতি উঠাইয়া দিবার প্রবল চেষ্টাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের ভিতরেও অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে উহাদের প্রবেশ নিবারণ অসম্ভব ব্যাপার। অনেকদিন এইরূপ অনুষ্ঠানপদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সাধারণে একটি প্রতীকের পরিবর্ত্তে অপর একটি গ্রহণ করে মাত্র। মুসলমানেরা মুসলমানেতর অন্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ, প্রতিমাকে পাপজনক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু কাবাস্থ তাঁহাদের নিজেদের মন্দিরের সম্বন্ধে একথা তাঁহাদের মনে হয় না। প্রত্যেক ধার্ম্মিক

সংস্কারকগণের মূর্ত্তিপূজা একেবারে উঠাইয়া দিবার চেষ্টা চিরদিনই বিফল হইয়াছে ও হইবে

মুসলমানকে নমাজের সময় ভাবিতে হয় যে, তিনি কাবার মন্দিরে রহিয়াছেন; আর তথায় তীর্থ করিতে গেলে তাঁহাদিগকে ঐ মন্দিরের দেয়ালস্থিত কৃষ্ণ প্রস্তরবিশেষকে চুম্বন করিতে হয়। উঁহাদের বিশ্বাস—লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীকৃত ঐ কৃষ্ণপ্রস্তরে মুদ্রিত চুম্বনচিহ্নগুলি বিশ্বাসিগণের কল্যাণের জন্য শেষ বিচারদিনে সাক্ষিস্বরূপে উপস্থিত হইবে। তারপর আবার 'জিমজিম' কূপ রহিয়াছে। মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন, ঐ কূপ হইতে যে কোন ব্যক্তি অল্প একটু জল উত্তোলন করিবেন, তাহারই পাপ ক্ষমা করা হইবে এবং তিনি পুনরুত্থানের পর নূতন দেহ পাইয়া অমর হইয়া থাকিবেন।

বাহ্য অনুষ্ঠান — প্রতীকোপাসনাদি প্রথমাবস্থায় অত্যাবশ্যক হইলেও উহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে

অন্যান্য ধর্ম্মে আবার গৃহরূপ প্রতীকের বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রটেষ্ট্যাণ্টদের মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা গীর্জ্জা অধিকতর পবিত্র। এই গীর্জ্জা একটি প্রতীকমাত্র। অথবা শাস্ত্রগ্রন্থ। খ্রীষ্টিয়ানগণের ধারনায় অন্যান্য প্রতীকাপেক্ষা শাস্ত্র পবিত্রতর প্রতীক। ক্যাথলিকগণ যেমন সাধুগণের মূর্ত্তি পূজা করেন, প্রটেষ্ট্যাণ্টেরা তদ্রূপ ক্রুশকে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধে প্রচার করা বৃথা, আর কেনই বা আমরা উহার বিরুদ্ধে প্রচার করিব? মানুষ প্রতীকোপাসনা করিতে পাইবে না, ইহার ত কোন যুক্তি নাই। উহাদের অন্তরালস্থ, উহাদের উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিনিধিস্বরূপে লোকে ঐগুলির ব্যবহার করিয়া থাকে। সমগ্র জগৎটিই একটি প্রতীকস্বরূপ—উহার মধ্য দিয়া—উহার সহায়তায়

—উহার বহির্দ্দেশে, উহার অন্তরালে অবস্থিত, উহার দ্বারা লক্ষিত বস্তুকে ধরিবার চেষ্টা আমরা করিতেছি। মানুষের প্রকৃতিই এই—সে একেবারে জগৎকে অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া এইরূপ জগতের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। কিন্তু যদিও আমরা জড়জগৎকে একেবারে অতিক্রম করিতে পারি না, তথাপি ইহাও সত্য যে, আমরা জড়জগৎ ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে—জড়জগৎ যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে লক্ষ করিতেছে, তাহাকে লাভ করিবার জন্যই সদা সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি। আমাদের চরম লক্ষ্য জড় নহে, চৈতন্য। ঘণ্টা, প্রদীপ, মূর্ত্তি, শাস্ত্রাদি, গীর্জ্জা, মন্দির, অনুষ্ঠানাদি এবং অন্যান্য পবিত্র প্রতীকসমূহ খুব ভাল বটে, ধর্ম্মরূপ ক্রমবর্দ্ধমান লতিকার বৃদ্ধির পক্ষে খুব সাহায্যকারী বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, উহার অধিক উহাদের আর কোন উপযোগিতা নাই। অধিকাংশ স্থলে আমরা দেখিতে পাই, উহার আর বৃদ্ধি হয় না! একটা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতর জন্মান ভাল, কিন্তু উহাতে নিবদ্ধ থাকিয়াই মরা ভাল নয়। এমন সমাজে বা সম্প্রদায়ে জন্মান ভাল, যাহার মধ্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালী প্রচলিত, ঐগুলি দ্বারা ধর্ম্মরূপ ক্ষুদ্র লতিকাটির বৃদ্ধির সাহায্য হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঐসকল অনুষ্ঠান-প্রণালীর ভিতর থাকিয়াই মরিয়া যায়, তাহাতে বুঝায়, তাহার উন্নতি হয় নাই, তাহার আত্মার বিকাশ মোটেই হয় নাই।

অতএব যদি কেহ বলে, এই সকল প্রতীক, অনুষ্ঠানাদি চিরকালের জন্য, তবে সে ভ্রান্ত; যদি কেহ বলে ঐগুলি আত্মার অনুন্নত অবস্থায় উহার উন্নতির সহায়ক, তবে সে ঠিক বলিতেছে।

এখানে আমি আর এক কথা বলিতে চাই যে, আত্মার উন্নতি বলিতে যেন আপনারা মানসিক উন্নতি বা বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি বুঝিবেন না। কোন ব্যক্তি একজন প্রকাণ্ড বুদ্ধিজীবী হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে সে হয়ত শিশুমাত্র অথবা তদপেক্ষাও অধম। আপনারা এখনই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আপনাদের মধ্যে সকলেই ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছেন। উহা ভাবিবার চেষ্টা করুন দেখি। সর্ব্বব্যাপী বলিতে কি বুঝায়, আপনাদের মধ্যে কয়জন ইহার কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারেন? যদি খুব চেষ্টা করেন, তবে হয়ত সমুদ্র বা আকাশ বা মরুভূমি বা একটা সুবৃহৎ হরিদ্বর্ণ প্রান্তরের ভাব মনে আনিতে পারেন। এই সমুদয়গুলিই জড় পদার্থ আর যত দিন না আপনারা সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মরূপে, আদর্শকে আদর্শরূপে ভাবিতে পারেন, ততদিন এই সকল জড়বস্তুর সহায়তা আপনাদিগকে লইতেই হইবে। ঐ জড়মূর্ত্তিগুলি আমাদের মনের ভিতরে অথবা মনের বাহিরে থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমরা সকলেই পৌত্তলিক হইয়া জন্মিয়াছি, আর পৌত্তলিকতা অন্যায় নহে, কারণ উহা মানবের প্রকৃতিগত। কে ইহা অতিক্রম করিতে পারে? কেবল সিদ্ধ ও জীবন্মুক্ত পুরুষেরাই পারেন। অবশিষ্ট সকলেই পৌত্তলিক। যতদিন আপনারা এই বিভিন্ন নামরূপ-বিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতেছেন, ততদিন আপনারা পৌত্তলিক। আমরা জগৎরূপ এই প্রকাণ্ড পুত্তলির অর্চ্চনা করিতেছি। যাহার

মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে প্রভেদ—আমরা সকলেই পৌত্তলিক

আপনাকে দেহ বলিয়া বোধ আছে, সে ত পৌত্তলিক হইয়াই জন্মিয়াছে। আমরা সকলেই আত্মা—নিরাকার আত্মস্বরূপ—অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ—আমরা কখনই জড় নহি। অতএব যে ব্যক্তি সূক্ষ্ম ধারণায় অক্ষম, যে ব্যক্তি নিজেকে জড় না ভাবিয়া, দেহস্বরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারে না, যে ব্যক্তি নিজ স্বরূপচিন্তায় অসমর্থ, সে পৌত্তলিক। তথাপি দেখুন, কেমন লোকে পরস্পর পরস্পরকে পৌত্তলিক বলিয়া বিবাদ করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ উপাস্যকে ঠিক মনে করে, কিন্তু অপরের উপাস্য তাহাদের মতে ঠিক নয়!

অতএব আমাদিগকে এই সকল শিশুজনোচিত ধারণা, অজ্ঞজনোচিত এই সকল বৃথা বাদানুবাদ ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহাদের মতে ধর্ম্ম কতকগুলি বাজে কথার সমষ্টি মাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম্ম কেবল কতকগুলি বিষয়ে বিচারবুদ্ধির সম্মতি বা অসম্মতি-প্রকাশ মাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম্ম তাহাদের পুরোহিতগণের কতকগুলি বাক্যে বিশ্বাসমাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম্ম তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কয়েকটি বিশ্বাসসমষ্টিমাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম্ম কতকগুলি ধারণা ও কুসংস্কার-সমষ্টি—সেগুলি তাহাদের জাতীয় কুসংস্কার বলিয়াই তাহারা সেগুলি ধরিয়া আছে। আমাদিগকে এই সব ভাব দূর করিয়া দিতে হইবে, দেখিতে হইবে—সমগ্র মানবজাতি যেন একটা প্রকাণ্ড শরীরী—ধীরে ধীরে আলোকাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে—উহা যেন এক অদ্ভুত উদ্ভিদ্‌স্বরূপ—ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া ঈশ্বরনামক অদ্ভুত সত্যের দিকে অগ্রসর

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম্ম, আর উহার প্রথম সোপান—অনুষ্ঠান

হইতেছে, আর উহার ঐ সত্যাভিমুখে প্রথম গতি সর্ব্বদাই জড়ের মধ্য দিয়া, অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে। ইহা এড়াইবার জো নাই।

নামোপাসনাই এই সমুদয় অনুষ্ঠানের হৃদয়স্বরূপ এবং অন্যান্য সমুদয় বাহ্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্ম ও জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে. উহাদের সকলের ভিতরই এই নামোপসনা প্রচলিত। নাম অতিশয় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বাইবেলে পড়া যায়, হিব্রুদের নিকট ভগবানের নাম এত পবিত্র বিবেচিত হইত যে, আর কিছুর সহিত উহার তুলনা হইতে পারে না। উহা সমুদয় নাম হইতে পবিত্রতর, আর তাঁহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঐ নামই ঈশ্বর। ইহা সত্য। জগৎ নামরূপ বই আর কি? আপনারা কি শব্দ ব্যতীত চিন্তা করিতে পারেন? শব্দ ও ভাবকে পৃথক্ করা যাইতে পারে না। যখনই আপনারা চিন্তা করেন, তখনই শব্দ অবলম্বনে চিন্তা করিতে হয়। একটি আর একটিকে লইয়া আসে। ভাব থাকিলেই শব্দ আসিবে, আবার শব্দ থাকিলেই ভাব আসিবে। সুতরাং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড যেন ভগবানের বাহ্য প্রতীক-স্বরূপ, তৎপশ্চাতে ভগবানের মহান্ নাম রহিয়াছে। প্রত্যেক ব্যষ্টিদেহই রূপ এবং ঐ দেহবিশেষের পশ্চাতে উহার নাম রহিয়াছে। যখনই আপনি আপনার বন্ধু-বিশেষের বিষয় চিন্তা করেন, তখনই তাঁহার শরীরের কথা, আর তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামও আপনার মনে উদিত হয়। ইহা

নামোপাসনা —উহার তাৎপর্য্য

মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। তাৎপর্য্য এই যে, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, মানবের চিত্তের মধ্যে রূপজ্ঞান ব্যতীত নামজ্ঞান আসিতে পারে না, এবং নামজ্ঞান ব্যতীত রূপজ্ঞান আসিতে পারে না। উহারা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। উহারা একই তরঙ্গের বাহিরের ও ভিতরের পিঠ। এই কারণে সমগ্র জগতে নামের মহিমা ঘোষিত ও নামোপাসনা প্রচলিত দেখা যায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ নামমাহাত্ম্য জানিতে পারিয়াছিল।

অবতার ও সাধুর পূজা—উহার স্বাভাবিকতা

আবার আমরা দেখিতে পাই, অনেক ধর্ম্মে অবতার বা মহাপুরুষগণের পূজা করা হয়। লোকে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। আবার সাধুগণের পূজাও প্রচলিত আছে। সমগ্র জগতে শত শত সাধুর পূজা হইয়া থাকে। না হইবেই বা কেন? আলোকপরমাণুর স্পন্দন সর্ব্বত্র রহিয়াছে। পেচক উহা অন্ধকারে দেখিতে পায়। তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে, উহা অন্ধকারে রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ অন্ধকারে দেখিতে পায় না। মানুষের পক্ষে ঐ আলোকপরমাণুর স্পন্দন কেবল প্রদীপ, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তিনি আপনাকে সমুদয় প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু মানুষের পক্ষে তিনি মানুষের ভিতরই প্রকাশিত। যখন তাঁহার আলোক, তাঁহার সত্তা, তাঁহার চৈতন্য মানুষেরই ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়, তখন, কেবল তখনই মানুষ তাঁহাকে বুঝিতে পারে। এইরূপে মানুষ চিরকালই মানুষের মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা করিতেছে, আর যতদিন সে মানব থাকিবে, ততদিন করিবে। সে উহার বিরুদ্ধে

চীৎকার করিতে পারে, উহার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু যখনই সে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে, সে বুঝিতে পারে, ভগবান্‌কে মানুষ বলিয়া চিন্তা করা মানুষের প্রকৃতিগত।

বিভিন্ন ধর্ম্মে বিরোধ, উদার ভাব আসিবার অন্যতম উপায় – বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা

অতএব আমরা প্রায় সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বরোপাসনার তিনটি সোপান দেখিতে পাই ;—প্রতীক বা মূর্ত্তি, নাম ও অবতার-উপাসনা। সকল ধর্ম্মেই এইগুলি আছে, কিন্তু দেখিতে পাইবেন, লোকে পরস্পর পরস্পরের সহিত বিরোধ করিতে চায়। কেহ কেহ বলিয়া থাকে, আমি যে নাম সাধনা করিতেছি তাহাই ঠিক নাম, আমি যে রূপের উপাসক তাহাই ভগবানের যথার্থ রূপ, আমি যে সব অবতার মানি তাঁহারাই ঠিক ঠিক অবতার, তুমি যে সব অবতারের কথা বল সেগুলি পৌরাণিক গল্পমাত্র। বর্ত্তমান কালের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সদয়-হৃদয় হইয়াছেন—তাঁহারা বলেন, প্রাচীন ধর্ম্মসমূহে যে সকল বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত ছিল, সেগুলি খ্রীষ্টধর্ম্মেরই পূর্ব্বাভাস মাত্র। অবশ্য তাঁহাদের মতে খ্রীষ্টধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম। প্রাচীন কালে ভগবান্ যে এই সব বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজ শক্তির পরীক্ষাস্বরূপ মাত্র। বিভিন্নপ্রকার ধর্ম্মের সৃজন করিয়া তিনি নিজ শক্তির পরীক্ষা করিতেছিলেন—শেষে খ্রীষ্টধর্ম্মে উহাদের চরম উন্নতি দাঁড়াইল। অবশ্য, এ ভাব অন্ততঃ পূর্ব্বেকার গোঁড়ামির চেয়ে অনেকটা ভাল, স্বীকার করিতে হইবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা ইহাও স্বীকার করিতেন না, তাঁহাদের নিজধর্ম্ম ছাড়া তাঁহারা

আর কিছুর বিন্দুমাত্র সত্যতাও মানিতেন না। এ ভাব ধর্ম্ম, জাতি বা শ্রেণীবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। লোকে সর্ব্বদাই ভাবে, তাহারা নিজেরা যাহা করিতেছে, অপরকেও কেবল তাহাই করিতে হইবে; আর এইখানেই বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনায় আমাদের সাহায্য হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, আমরা যে ভাবগুলিকে আমাদের নিজস্ব, সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া মনে করিতেছিলাম, সেগুলি শত শত বর্ষ পূর্ব্বে অপরের ভিতর বর্ত্তমান ছিল, সময়ে সময়ে বরং আমরা যে ভাবে উহা ব্যক্ত করিয়া থাকি, তদপেক্ষা সুপরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত ছিল!

ধর্ম্ম অপরোক্ষানুভূতিস্বরূপ—ইহার অভাবেই লোকে পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে

মানুষকে ভক্তির এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হয়; কিন্তু যদি সে প্রকৃতপক্ষে অকপট হয়, যদি সে যথার্থ সত্যে পৌঁছিতে চায়, তবে সে এমন এক ভূমিতে ক্রমশঃ উপনীত হয়, যেখানে বাহ্য অনুষ্ঠানের কোন প্রকার আবশ্যকতা থাকে না। ধর্ম্মমন্দির, শাস্ত্রাদি, অনুষ্ঠান—এগুলি কেবল ধর্ম্মের শিশুশিক্ষা মাত্র, যাহাতে মানবের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সতেজ হইয়া সে ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে। আর যদি কাহারও ধর্ম্মের প্রয়োজন হয়, তবে তাহাকে এই প্রথম সোপানগুলি অবলম্বন করিতেই হইবে। যখনই ভগবানের জন্য পিপাসা হয়, যখনই লোকে ব্যাকুল হইয়া ভগবান্‌কে প্রার্থনা করে, তখনই তাহার যথার্থ ভক্তির উদ্রেক হয়। কে তাঁহাকে চায়? ইহাই প্রশ্ন। ধর্ম্ম মতমতান্তরে নাই, তর্কযুক্তিতে নাই; ধর্ম্ম—হওয়া, ধর্ম্ম অপরোক্ষানুভূতিস্বরূপ।

আমরা দেখিতে পাই, দুনিয়ার সকলেই জীবাত্মা এবং জগতের সর্ব্বপ্রকার রহস্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা কয়, কিন্তু তাহাদের এক এক জনকে ধরিয়া যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছ, তুমি কি আত্মাকে দর্শন করিয়াছ—কয়জন লোক বলিতে পারে যে তাহারা তাহা করিয়াছে? এক সময়ে ভারতের কোন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা আসিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইল। একজন বলিল, শিবই একমাত্র দেবতা, অপর একজন বলিল, বিষ্ণুই একমাত্র দেবতা। পরস্পরের এইরূপ তর্কবিচার চলিতে লাগিল, তর্কের আর বিরাম কিছুতেই হয় না। সেই স্থান দিয়া একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যাইতে-ছিলেন, তাহারা তাঁহাকে ঐ প্রশ্নের মীমাংসার্থ আহ্বান করিল। তিনি তাহাদের নিকট গিয়া শৈবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি শিবকে দেখিয়াছেন? আপনার সঙ্গে কি তাঁহার পরিচয় আছে? যদি তাহা না থাকে, তবে আপনি কিরূপে জানিলেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা? তার পর তিনি বৈষ্ণবদিগকেও ঐ প্রশ্ন করিলেন—আপনারা কি বিষ্ণুকে দেখিয়াছেন? সকলকে ঐ প্রশ্ন করিলে জানিতে পারা গেল, ভগবৎসম্বন্ধে কেহই কিছু জানে না, আর তাই তাহারা অত বিবাদ করিতেছিল। কারণ, যদি তাহারা সত্য সত্য ভগবান্‌কে জানিত, তবে আর তাহারা তর্ক করিত না। শূন্য কলসী জলে ডুবাইলে তাহাতে ভক্ ভক্ শব্দ হইতে থাকে, কিন্তু পূর্ণ হইয়া গেলে আর কোন শব্দ হয় না। অতএব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর এই যে বিবাদ বিসম্বাদ দেখা যাইতেছে, ইহাতে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, উহারা ধর্ম্মের 'ধ'ও জানে না।

ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষে কেবল কতকগুলি বাজে কথামাত্র—বই এ লিখিবার জন্য। সকলেই এক একখানা বড় বই লিখিতে ব্যস্ত। তাহাদের ইচ্ছা—উহার কলেবর যতদূর সম্ভব বড় হউক; তাহারা যেখান হইতে পারে চুরি করিয়া পুস্তকের কলেবর বাড়াইতে থাকে, অথচ কাহারও নিকট নিজ ঋণ স্বীকার করে না। তার পর তাহারা জগতের সমক্ষে উহা প্রকাশিত করিতে অগ্রসর হয়—আর পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান সহস্র সহস্র বিরোধের সৃষ্টি করে।

যে ভগবান্‌কে চায় সে-ই তাঁহাকে পাইয়া থাকে

জগতের অধিকাংশ লোকই নাস্তিক। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য জগতে আর এক প্রকার নাস্তিক অর্থাৎ জড়বাদী দলের অভ্যুদয়ে আমি আনন্দিত, কারণ ইহারা অকপট নাস্তিক। ইহারা কপট ধর্ম্মবাদী নাস্তিক হইতে শ্রেষ্ঠ। এই শেষোক্ত নাস্তিকেরা ধর্ম্মের কথা কয়, ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ করে, কিন্তু ধর্ম্ম কখন চায় না—ধর্ম্মকে বুঝিবার, ধর্ম্মকে সাক্ষাৎকার করিবার চেষ্টা করে না। যীশুখ্রীষ্টের সেই বাক্যাবলী স্মরণ রাখিবেন—"চাহিলেই তোমাকে দেওয়া হইবে; অনুসন্ধান করিলেই পাইবে; করাঘাত করিলেই দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইবে।" এই কথাগুলি উপন্যাস, রূপক বা কল্পনা নহে, এগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। উহারা জগতে যে সকল ঈশ্বরাবতার মহাপুরুষগণ আসিয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের উচ্ছ্বাসস্বরূপ—ঐ কথাগুলি পুঁথিগত বিদ্যার পরিচয় নহে, উহারা প্রত্যক্ষানুভূতির ফলস্বরূপ—ঐগুলি এমন এক লোকের কথা, যিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, যিনি ভগবানের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন,

ভগবানের সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন—আপনি আমি এই বাড়ীটাকে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যিনি তাহা অপেক্ষা শতগুণ উজ্জ্বলভাবে ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্‌কে চায় কে? ইহাই প্রশ্ন। আপনারা কি মনে করেন, দুনিয়া-শুদ্ধ লোক ভগবান্‌কে চাহিয়াও পাইতেছে না? তাহা কখনই হইতে পারে না! মানবের এমন কি অভাব আছে, যে অভাবের পূরণোপযোগী বস্তু বাহিরে নাই? মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজন—তাহার জন্য বায়ু রহিয়াছে। মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন—আহার্য্য বস্তু রহিয়াছে। এই সব বাসনার উৎপত্তি হয় কোথা হইতে? বাহ্যবস্তু আছে বলিয়া। আলোকের সত্তা থাকাতেই চক্ষুর উৎপত্তি হইয়াছে, শব্দের সত্তা থাকাতেই কর্ণ হইয়াছে। এইরূপ, মানুষের মধ্যে যে কোন বাসনা আছে, তাহাই পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত কোন বাহ্যবস্তু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; আর এই যে, পূর্ণত্বলাভের, সেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিবার, প্রকৃতির পারে যাইবার ইচ্ছা—উহা যদি পূর্ণস্বরূপ কোন পুরুষ আমাদের ভিতর প্রবেশ না করাইয়া দিয়া থাকেন, তবে কোথা হইতে উহার উৎপত্তি হইল? অতএব ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে, যাঁহার ভিতর এই আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছে, তিনিই সেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিবেন। কিন্তু কথা এই যে, কাহার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে? আমরা ভগবান্ ছাড়া আর সব জিনিসই চাহিয়া থাকি। আপনারা সমাজে ধর্ম্ম বলিয়া যাহা দেখিতে পান, তাহাকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা যায় না। আমাদের গৃহিণীর সমগ্র জগৎ হইতে সংগৃহীত নানাবিধ আসবাব আছে—কিন্তু এখনকার ফ্যাসান, জাপানী কোন জিনিস

ঘরে রাখা—তাই তিনি একটা জাপানী জিনিস কিনিয়া ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলেন। অধিকাংশ লোকের পক্ষে ধর্ম্ম এইরূপ। তাহাদের ভোগের জন্য সর্ব্বপ্রকার বস্তু রহিয়াছে—কিন্তু ধর্ম্মের একটু চাটনী তার সঙ্গে না দিলে জীবনটা যেন ফাঁকা ফাঁকা হইয়া যায়। কারণ, তাহা হইলে সমাজে নানা অকথা কুকথা বলে। সমাজ তাহাদের নিকট উহার আশা করিয়া থাকে —সেই জন্যই নরনারীগণ একটু আধটু ধর্ম্ম করিয়া থাকে। সমগ্র জগতে আজকাল ধর্ম্মের এই অবস্থা।

গুরুশিষ্য-সংবাদ—ভগবানের জন্য প্রাণ যায় যায় হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়

এক সময়ে জনৈক শিষ্য তাহার গুরুর নিকটে গিয়া বলিল—"প্রভো, আমি ধর্ম্মলাভ করিতে চাই।" গুরু একবার শিষ্যের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোন কথা বলিলেন না—কেবল একটু হাসিলেন। শিষ্য প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতে লাগিল —"আমাকে ধর্ম্মলাভের উপায় বলিয়া দিতেই হইবে।" গুরু অবশ্য কিসে কি হয় শিষ্যাপেক্ষা যথেষ্ট ভাল বুঝিতেন। একদিন খুব গ্রীষ্মের সময়ে তিনি সেই যুবককে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গেলেন। যুবক জলে ডুব দিবামাত্র গুরু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাহাকে চাপিয়া জলের নীচে ধরিয়া রাখিলেন। যুবক জল হইতে উঠিবার জন্য অনেক ধস্তাধস্তি করিবার পর গুরু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখন জলের ভিতর ছিলে, তখন তোমার সর্ব্বাপেক্ষা কিসের অধিক অভাব বোধ হইয়াছিল?" শিষ্য উত্তর করিল, "হাওয়ার অভাবে প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল।" তখন গুরু উত্তর দিলেন,

"ভগবানের জন্য কি তোমার ঐরূপ অভাব বোধ হইয়াছে? যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে এক মুহূর্ত্তেই তুমি তাঁহাকে পাইবে।" যতদিন না ধর্ম্মের জন্য আপনাদের ঐরূপ তীব্র পিপাসা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে, ততদিন যতই তর্ক বিচার করুন, যতই বই পড়ুন, যতই বাহ্য অনুষ্ঠান করুন, কিছুতেই কিছুই হইবে না। যতদিন না হৃদয়ে এই ধর্ম্মপিপাসা জাগিতেছে, ততদিন নাস্তিক হইতে আপনি কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ নহেন! নাস্তিকের বরং ভাবের ঘরে চুরি নাই, আপনার আছে।

জনৈক মহাপুরুষ বলিতেন, "মনে কর, এঘরে একটা চোর রহিয়াছে—সে কোনরূপে জানিতে পারিয়াছে যে, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে একতাল সোনা আছে, আর ঐ দুইটি ঘরের মধ্যে যে দেওয়াল আছে, তাহা খুব পাতলা ও কম মজবুত। এরূপ অবস্থায় ঐ চোরের কিরূপ অবস্থা হইবে মনে কর? তাহার ঘুম হইবে না, সে খাইতে পারিবে না বা আর কিছু করিতে পারিবে না—কেবল কিরূপে সেই সোনার তাল সংগ্রহ করিবে, তাহার মন সেই দিকে পড়িয়া থাকিবে। সে কেবল ভাবিবে, কিরূপে ঐ দেয়াল ছিদ্র করিয়া সোণার তালটা লইব। তোমরা কি বলিতে চাও, যদি লোকে যথার্থ বিশ্বাস করিত যে, আনন্দ ও মহিমার খনিস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ এখানে রহিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া সাধারণভাবে সাংসারিক কার্য্য করিতে সমর্থ হইত?" যখনই মানুষ বিশ্বাস করে যে, ভগবান্ বলিয়া একজন কেহ আছেন, তখনই সে তাঁহাকে পাইবার

'চোর ও সোনার তাল,'—ঈশ্বরলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা

প্রবল আকাঙ্ক্ষায় পাগল হইয়া উঠে। অপরে নিজ নিজ ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে, কিন্তু যখন মানুষ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে যে, সে যেভাবে জীবন যাপন করিতেছে, তদপেক্ষা উচ্চতর ভাবে জীবন যাপন করা যাইতে পারে, যখনই সে নিশ্চিত জানিতে পারে যে, ইন্দ্রিয়গুলিই মানবের সর্ব্বস্ব নহে, যখনই সে বুঝিতে পারে যে, আত্মার অবিনাশী, নিত্য আনন্দের তুলনায় এই সসীম জড়দেহ কিছুই নহে, তখন সে যতক্ষণ না নিজে সেই আনন্দ লাভ করিতেছে, ততক্ষণ পাগলের মত উহারই অনুসন্ধান করে; আর এই উন্মত্ততা, এই পিপাসা, এই ঝোঁককে ধর্ম্মজীবনে 'জাগরণ' বলে—আর যখনই মানুষের উহা আসিয়া থাকে, তখনই তাহার ধর্ম্মের আরম্ভ হয়।

কিন্তু ইহা হইতে অনেক দিন লাগে। এইসমুদয় অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ, প্রার্থনা, স্তবস্তুতি, তীর্থ পর্য্যটন, শাস্ত্রাদি পাঠ, কাঁসর-ঘণ্টা, প্রদীপ, পুরোহিত—এ সকল ঐ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইবার সহায়ক মাত্র। ঐগুলি দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। আর যখনই আত্মা শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন উহা স্বভাবতঃই উহার মূলকারণস্বরূপ, সমুদয় বিশুদ্ধির আকর স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট যাইতে আকাঙ্ক্ষা করে। শত শত যুগের ধূলি-আচ্ছাদিত লৌহখণ্ড, চুম্বকের নিকট পড়িয়া থাকিলেও তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু যদি কোন উপায়ে ঐ ধূলি অপসারিত করা যায়, তবে আবার উহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। জীবাত্মাও এইরূপ শত শত যুগের অপবিত্রতা, মলিনতা ও পাপরূপ ধূলিজালে আবৃত

অনেক দিন ধরিয়া অনুষ্ঠানাদি করিবার পর ভগবানের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে

রহিয়াছে। অনেক জন্ম ধরিয়া এই সব ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদি করিয়া, অপরের কল্যাণসাধন করিয়া, অপরকে ভালবাসিয়া যখন সে বিশেষরূপ পবিত্র হয়, তখন তাহার ভগবানের দিকে স্বাভাবিক আকর্ষনের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সে তখন জাগরিত হইয়া ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকে।

কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠান, প্রতীকোপাসনা প্রভৃতিকে ধর্ম্মের আরম্ভমাত্র বলা যাইতে পারে, উহাদিগকে ঈশ্বরপ্রেম নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না। আমরা প্রেমের কথা সর্ব্বত্র শুনিয়া থাকি। সকলেই বলে, ভগবান্‌কে ভালবাস—কিন্তু ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা লোকে জানে না। যদি জানিত, তবে যখন তখন ওকথা মুখে আনিত না। সকলেই বলিয়া থাকে, তাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অতি শীঘ্রই সে বুঝিতে পারে, তাহার প্রকৃতিতে ভালবাসা নাই। সকল রমণীই বলিয়া থাকে, তাহারা প্রেমসম্পন্না, কিন্তু তাহারাও শীঘ্র দেখিতে পায় যে, তাহারা ভালবাসিতে অক্ষম। এই সংসার ভালবাসার কথায় পূর্ণ, কিন্তু ভালবাসা বড় কঠিন। কোথায় ভালবাসা? ভালবাসা যে আছে, তাহা আপনি কিরূপে জানিবেন? ভালবাসার প্রথম লক্ষণ এই যে, উহাতে কেনাবেচা নাই। এক ব্যক্তি যখন অপরকে তাহার নিকট হইতে কিছু পাইবার জন্য ভালবাসে, জানিবেন, সে ভালবাসা নহে, দোকানদারী মাত্র। যেখানে কেনাবেচার কথা, সেখানে প্রেম নাই। অতএব যখন কোন ব্যক্তি ভগবানের নিকট 'ইহা

প্রকৃত প্রেম বড় কঠিন। উহার প্রথম লক্ষণ—উহাতে কেনা-বেচার ভাব থাকিবে না

দাও, উহা দাও' বলিয়া প্রার্থনা করে, জানিবেন—সে প্রেম নহে। উহা কেমন করিয়া প্রেম হইতে পারে? আমি তোমাকে আমার প্রার্থনা স্তবস্তুতি উপহার দিলাম—তুমি তাহার পরিবর্তে আমায় কিছু দাও—এ ত কেবল দোকানদারী মাত্র।

সাধু-সম্রাট্-সংবাদ—প্রেম চিরকালই দাতা—গ্রহীতা নহে

একজন সম্রাট্ একবার বনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন—তথায় তাঁহার সহিত জনৈক সাধুর সাক্ষাৎ হইল। সাধুর সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া তিনি এত সুখী হইলেন যে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিকট হইতে কিছু লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সাধু বলিলেন—'না, আমি আমার অবস্থায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। এই সব বৃক্ষ আমাকে খাইবার জন্য যথেষ্ট ফল প্রদান করে, এই রমণীয় পবিত্রসলিলা স্রোতস্বিনীগণ আমার যত প্রয়োজন জল প্রদান করে। শয়ন করিবার জন্য এই সব গুহা রহিয়াছে। অতএব তুমি রাজাই হও আর সম্রাট্ই হও, তোমার প্রদত্ত উপহার লইয়া আমার কি হইবে?' সম্রাট্ বলিলেন,—'কেবল আমাকে পবিত্র করিবার জন্য, আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করুন এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমার রাজধানীতে আসুন।' অনেক পীড়াপীড়ির পর অবশেষে সাধু সম্রাটের সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলেন। সাধুকে সম্রাটের প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল—তথায় চতুর্দ্দিকে সোনা, হীরা, মণি-মাণিক্য, জহরত এবং আরো অনেক অদ্ভুত বস্তুজাত রহিয়াছে—চতুর্দ্দিকে ঐশ্বর্য্য-বৈভবের চিহ্ন। এই স্থানে সেই অরণ্যবাসী দরিদ্র সাধুকে লইয়া যাওয়া হইল। সম্রাট্ বলিলেন,—'আপনি ক্ষণকালের

জন্য অপেক্ষা করুন—আমি আমার প্রার্থনাবাক্য আবৃত্তি করিয়া লইতেছি।' এই বলিয়া তিনি গৃহের এক কোণে গিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—'প্রভো, আমায় আরো অধিক ঐশ্বর্য্য, আরো অধিক সন্তানসন্ততি, আরো অধিক রাজ্য প্রদান করুন।' ইতিমধ্যে সাধু উঠিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সম্রাট্ তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বলিতে লাগিলেন—'মহাশয়, কোথা যাইতেছেন? আপনি আমার উপহার গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছেন?' তখন সাধু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—'ভিক্ষুক, আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করি না। তুমি আর কি দিতে পার? তুমি নিজেই ক্রমাগত ভিক্ষা করিতেছ!' পূর্ব্বোক্ত সম্রাটের প্রার্থনা প্রেমের ভাষা নহে। যদি ভগবানের নিকট ইহা উহা প্রার্থনা করা চলে, তবে প্রেমে ও দোকানদারীতে প্রভেদ কি? সুতরাং প্রেমের প্রথম লক্ষণই এই যে, উহাতে কোনরূপ কেনাবেচা নাই—প্রেম সর্ব্বদা দিয়াই যায়। প্রেম চিরকালই দাতা—গ্রহীতা কোন কালেই নহে। ভগবানের সন্তান বলেন,—'যদি ভগবান্ চান, তবে আমি তাঁহাকে আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারি, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আমি কিছুই চাহি না, এই জগতের কোন জিনিসই আমি চাহি না। তাঁহাকে ভালবাসিতে ভাল লাগে বলিয়াই আমি তাঁহাকে ভালবাসিয়া থাকি, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট কোনরূপ অনুগ্রহ ভিক্ষা চাহি না।' কে জানিতে চায় ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ কি না! কারণ, আমি তাঁহার নিকট হইতে কোন শক্তিও চাহি না এবং তাঁহার কোনরূপ শক্তির বিকাশও দেখিতে চাহি না। তিনি

প্রেমের ভগবান্—ইহা জানিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি আর কিছু জানিতে চাহি না।'

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। কাহাকেও ভয় দেখাইয়া কি ভালবাসান যায়? হরিণ কি কখন সিংহকে ভালবাসে? না—মূষিক বিড়ালকে? না—দাস প্রভুকে ভালবাসে? ক্রীতদাসগণ সময়ে সময়ে ভালবাসার ভান করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক কি উহা ভালবাসা? ভয়ে ভালবাসা কবে কোথায় দেখিয়াছেন? যদি কোথাও দেখা যায়, তবে উহা ভানমাত্র জানিতে হইবে। যতদিন লোকে ভগবান্‌কে মেঘপটলারূঢ়, এক হস্তে পুরস্কার ও অপর হস্তে দণ্ডধারী বলিয়া চিন্তা করে, ততদিন ভালবাসা আসিতে পারে না। ভালবাসা থাকিলে কখন ভয়ের ভাব আসিবে না! ভাবিয়া দেখুন—একজন তরুণী রমণী রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আর একটা কুকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—অমনি তিনি সাম্‌নে যে বাড়ী দেখিতে পাইলেন, তথায়ই গিয়া আশ্রয় লইলেন। মনে করুন, পরদিনও তিনি ঐরূপে রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—সঙ্গে ছেলে রহিয়াছে। মনে করুন, একটা সিংহ আসিয়া ছেলেটাকে আক্রমণ করিল—তখন তিনি কোথায় থাকিবেন, বলুন দেখি! তিনি যে তখন তাঁহার ছেলেকে রক্ষা করিবার জন্য সিংহের মুখে যাইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এখানে প্রেম ভয়কে জয় করিয়াছে, ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধেও এইরূপ। ভগবান্ বরদাতা বা দণ্ডদাতা—ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? প্রকৃত প্রেমিক কখনও

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ—প্রেমে ভয়ের লেশমাত্র নাই

সে চিন্তায় আকুল হয় না। একজন বিচারপতির কথা ধরুন—তিনি যখন কার্য্যাবসানে গৃহে আসেন, তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে কি ভাবে দেখিয়া থাকে? সে তাঁহাকে বিচারপতি কিম্বা পুরস্কার বা শাস্তিদাতা বলিয়া দেখে না—সে তাঁহাকে তাহার স্বামী বলিয়া তাহার প্রেমাস্পদ বলিয়া দেখিয়া থাকে। তাঁহার ছেলেরা তাঁহাকে কি ভাবে দেখে? তাহাদের স্নেহময় পিতা বলিয়া দেখে, পুরস্কার বা শাস্তিদাতা বলিয়া দেখে না। এইরূপ ভগবানের সন্তানেরাও কখনও তাঁহাকে পুরস্কার বা দণ্ডবিধাতা বলিয়া দেখেন না। বাহিরের লোকে—যাহারা তাঁহার প্রেমের আস্বাদ কখনও পায় নাই, তাহারাই তাঁহাকে ভয় করিয়া তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা কাঁপিতে থাকে। এ সব ভয়ের ভাব—ভগবান্ বরদাতা বা দণ্ডদাতা, এসব ভাব ছাড়িয়া দিন। অবশ্য যাহারা ঘোরতর বর্ব্বর-প্রকৃতির, তাহাদের পক্ষে হয় ত ইহার কিছু উপকারিতা থাকিতে পারে। অনেক লোক—খুব বুদ্ধিমান্ লোকও ধর্ম্মজগতে বর্ব্বরতুল্য—সুতরাং এ ভাবগুলিতে তাহাদিগের উপকার হইতে পারে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর, যাঁহাদের যথার্থ ধর্ম্মসাক্ষাৎকারের আর বিলম্ব নাই, যাঁহাদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে ওসব ভাব ছেলেমানুষী মাত্র, আহাম্মকী মাত্র। এইরূপ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ভয়ের ভাব একেবারে পরিত্যাগ করেন।

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর। প্রেম সর্ব্বদাই উচ্চতম আদর্শস্বরূপ। যখন মানুষ এই দুই সোপান অতিক্রম করিয়া যায়, যখন সে দোকানদারী ও ভয়ের ভাব ছাড়িয়া দেয়,

তখন সে বুঝিতে থাকে যে, প্রেমই সর্ব্বদা আমাদের উচ্চতম আদর্শ ছিল। আমরা এই জগতে অনেক সময় দেখিতে পাই যে, পরমা সুন্দরী রমণী অতি কুৎসিৎ পুরুষকে ভালবাসিতেছে, আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরম সুন্দর পুরুষ অতি কুৎসিতা রমণীকে ভালবাসিতেছে। তাহারা কিসে আকৃষ্ট হইতেছে? বাহিরের লোকে সেই স্ত্রী বা পুরুষকে কুৎসিৎ বলিয়াই দেখিবে, কিন্তু প্রেমিক তাহা কখন দেখিবে না। প্রেমিকের চক্ষে প্রেমাস্পদের তুল্য পরম সুন্দর আর কেহ নাই। ইহা কিরূপে হয়? যে রমণী কুৎসিৎ পুরুষকে ভালবাসিতেছে, সে যেন তাহার নিজ মনের অভ্যন্তরবর্ত্তী সৌন্দর্য্যের আদর্শ লইয়া ঐ কুৎসিৎ পুরুষের উপর প্রক্ষেপ করিতেছে, আর সে যে সেই কুৎসিৎ পুরুষকে পূজা করিতেছে ও ভালবাসিতেছে, তাহা নহে, সে তাহার আদর্শের পূজা করিতেছে। সেই পুরুষটি যেন উপলক্ষ মাত্র, আর সেই উপলক্ষের উপর সে তাহার নিজ আদর্শকে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাই তাহার উপাস্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার প্রেমেই একথা খাটে। ভাবিয়া দেখুন, আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই ভাইভগিনীগুলির রূপ যে কিছু অসাধারণ রকমের, তাহা নহে, কিন্তু আমাদের ভাইভগিনী বলিয়াই তাহাদিগকে আমরা পরম সুন্দর ভাবিয়া থাকি।

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ—প্রেমই আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ

এই সব ব্যাপারে দার্শনিক ব্যাখ্যা এই যে, সকলেই নিজ নিজ আদর্শ বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া তাহারই উপাসনা করিয়া থাকে। এই বহির্জ্জগৎ কেবল উপলক্ষ মাত্র। আমরা যাহা কিছু

দেখি, তাহা আমাদেরই মন হইতে বহিঃপ্রক্ষিপ্ত মাত্র। একটা শামুকের খোলার ভিতর একটা বালুকণা প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতর একটা উত্তেজনা উৎপাদন করিল। ঐ উত্তেজনায় উহার মধ্য হইতে রস নির্গত হইয়া সেই বালুকণাকে আবৃত করিতে থাকে এবং তাহার ফলে পরম সুন্দর মুক্তার উৎপত্তি। আমরাও ঠিক এইরূপ করিতেছি। বহির্জ্জগৎ বালুকণার মত আমাদের চিন্তার উপলক্ষস্বরূপ মাত্র—উহাদের উপর আমরা আমাদের নিজ ভাব প্রক্ষেপ করিয়া এই সব বাহ্যবস্তু সৃষ্টি করিতেছি। মন্দ লোকেরা এই জগৎটাকে একটা ঘোর নরকরূপে দেখিয়া থাকে, তদ্রূপ ভাল লোকে ইহাকে পরম স্বর্গ বলিয়া দেখে। প্রেমিকেরা এই জগৎকে প্রেমপূর্ণ বলিয়া এবং দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্বেষপূর্ণ বলিয়া মনে করে। বিবাদপরায়ণ ব্যক্তিগণ ইহাতে বিবাদ বিরোধ বই আর কিছু দেখিতে পায় না, আবার শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ ইহাতে শান্তি ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পান না ; আর যিনি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইহাতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করেন না। সুতরাং দেখা গেল, আমরা সর্ব্বদাই আমাদের উচ্চতম আদর্শেরই উপাসনা করিয়া থাকি, আর যখন আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় আমরা আদর্শকে আদর্শ-রূপেই উপাসনা করিতে পারি, তখন আমাদের তর্কযুক্তি ও সন্দেহ সব দূরে যায়। তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে কি না, এ কথা লইয়া কে মাথা ঘামায় ? আদর্শ ত কখন নষ্ট হইতে পারে না, কারণ উহা আমার প্রকৃতির অংশস্বরূপ। যখন আমি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিব, তখনই আমি ঐ আদর্শ সম্বন্ধে

সন্দেহ করিতে পারি, কিন্তু আমি যখন একটিতে সন্দেহ করিতে পারি না, তখন অপরটিতেও করিতে পারি না। বিজ্ঞান আমার বহির্দেশে অবস্থিত, আকাশের স্থানবিশেষনিবাসী, খেয়াল অনুযায়ী জগতের শাসনকারী, কয়েকদিন ধরিয়া সৃষ্টি করিয়া অবশিষ্ট কাল নিদ্রাগত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারুক না পারুক, ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? ঈশ্বর এক সময়েই সর্ব্বশক্তিমান ও পূর্ণ দয়াময় হইতে পারেন কি না, ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায়? ভগবান্ মানুষের পুরস্কারদাতা কি না, এবং তিনি আমাদিগকে ক্ষমতাবান্ ঘোর অত্যাচারী পুরুষের অথবা দয়াশীল সম্রাটের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন কি না, এ বিষয় লইয়া কে মাথা ঘামায়? প্রেমিক এই সমুদয় পুরস্কার-শাস্তির, ভয়-সন্দেহের এবং বৈজ্ঞানিক বা অন্য সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের বাহিরে গিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে প্রেমের আদর্শই যথেষ্ট আর এই জগৎ যে এই প্রেমেরই প্রকাশস্বরূপ—ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ নহে?

প্রেমই সকলের মূলে

কিসে অণুতে অণুতে, পরমাণুতে পরমাণুতে মিলাইতেছে? কিসে বড় বড় গ্রহ উপগ্রহ পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, একজন পুরুষ অপরের প্রতি, নর নারীর প্রতি, নারী নরের প্রতি, ইতরজন্তু ইতর জন্তুগণের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে?—যেন সমুদয় জগৎটাকে এক কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে? ইহাকে প্রেম বলে। ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত, আব্রহ্মস্তম্ব এই প্রেমের প্রকাশ—এই প্রেম সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্। চেতন অচেতন, ব্যষ্টি সমষ্টি সকলেতেই এই ভগবৎপ্রেম আকর্ষণী শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র সমুদয় বস্তুর পরিচালিকা

শক্তি। এই প্রেমের প্রেরণায়ই খ্রীষ্ট সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, বুদ্ধ, এমন কি তির্য্যগ্‌জাতির জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; ইহার প্রেরণায়ই মাতা সন্তানের জন্য এবং পতি পত্নীর জন্য প্রাণত্যাগে উদ্যত হয়। এই প্রেমের প্রেরণায়ই লোকে তাহাদের দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়; আর আশ্চর্য্য, সেই একই প্রেমের প্রেরণায় চোর চুরি করে, হত্যাকারী হত্যা করে। এই সব স্থলেও মূলে ঐ প্রেম—কিন্তু তাহার প্রকাশ বিভিন্ন। ইহাই জগতে সকলেরই একমাত্র পরিচালিকা শক্তি। চোরের টাকার উপর প্রেম—প্রেম তাহার ভিতর রহিয়াছে, কিন্তু উহা প্রকৃত বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয় নাই। এইরূপ সমুদয় পাপ ও সমুদয় পুণ্য কর্ম্মের পশ্চাতেই সেই অনন্ত প্রেম রহিয়াছে। মনে করুন, আপনাদের মধ্যে কেহ একটা ঘরে বসিয়া পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ লইয়া নিউইয়র্কের গরীবদের জন্য হাজার ডলারের একখানি চেক লিখিয়া দিলেন, আবার ঠিক সেই সময়েই সেই গৃহে আর একজন বসিয়া একজন বন্ধুর নাম জাল করিল। এক আলোতেই দুইজনে লিখিতেছে, কিন্তু যে যেভাবে উহার ব্যবহার করিতেছে, সে তাহার জন্য দায়ী হইবে—আলোর কোন দোষ গুণ নাই। এই প্রেম সর্ব্ববস্তুতে প্রকাশিত অথচ নির্লিপ্ত, ইনিই সমগ্র জগতের পরিচালিকা শক্তি—ইঁহার অভাবে জগৎ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে নষ্ট হইয়া যাইবে আর এই প্রেমই ঈশ্বর।

'কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির অভ্যন্তরে যে আত্মা রহিয়াছেন, তাঁহার জন্যই লোকে পতিকে ভালবাসে;

কেহই পত্নীর জন্য পত্নীকে ভালবাসে না, পত্নীর অভ্যন্তরে যে আত্মা রহিয়াছেন, তাঁহার জন্যই লোকে পত্নীকে ভালবাসে; কেহই সেই সেই বস্তুর জন্য সেই সেই বস্তুকে ভালবাসে না, আত্মার জন্যই সেই সেই বস্তুকে ভালবাসিয়া থাকে।' এমন কি, এই স্বার্থপরতা যাহাকে লোকে এত নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাও সেই প্রেমেরই এক প্রকার রূপমাত্র। এই খেলা হইতে সরিয়া দাঁড়ান, ইহাতে মিশিবেন না, কেবল এই অদ্ভুত দৃশ্যাবলী, এই বিচিত্র নাটক—এক দৃশ্য অভিনীত হইল, আর এক দৃশ্য আসিতেছে—দেখিয়া যান, আর এই অদ্ভুত ঐক্যতান শ্রবণ করুন—সবই সেই একই প্রেমের বিভিন্ন রূপমাত্র। ঘোর স্বার্থপরতার মধ্যেও দেখা যায়, ঐ 'স্ব' এর, ঐ 'অহং'এর ক্রমশঃ বিস্তৃতি ঘটিতে থাকে। সেই এক অহং একটা লোক বিবাহিত হইলে দুইটা হইল, ছেলেপুলে হইলে অনেকগুলি হইল—এইরূপে তাহার 'অহং'এর বিস্তৃতি হইতে থাকে, অবশেষে সমগ্র জগৎ তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সার্ব্বজনীন প্রেম—অনন্ত প্রেমে পরিণত হয়, আর এই প্রেমই ঈশ্বর।

ক্ষুদ্র স্বার্থপর প্রেমই বিস্তৃত হইতে হইতে অনন্ত প্রেমে পরিণত হয়

এইরূপে আমরা পরা ভক্তিতে উপনীত হই—এই অবস্থায় অনুষ্ঠান প্রতীকাদির আর কোন প্রয়োজন থাকে না। যিনি ঐ অবস্থায় পঁহুছিয়াছেন, তিনি আর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারেন না, কারণ, সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার ভিতর রহিয়াছে। তিনি আর কোন্ সম্প্রদায়ের হইবেন? সমুদয় গীর্জ্জা মন্দিরাদি ত

তাঁহার ভিতরেই রহিয়াছে। এত বড় গীর্জ্জা কোথায়, যাহা তাঁহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে? এরূপ ব্যক্তি আপনাকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। তিনি যে অসীম প্রেমের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার কি আর কিছু সীমা আছে? যে সকল ধর্ম্ম এই প্রেমের আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সকলেরই মধ্যে ইহাকে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যদিও আমরা জানি, এই প্রেম বলিতে কি বুঝায়, যদিও আমরা জানি এই বিভিন্ন আসক্তি ও আকর্ষণময় জগতে সমুদয়ই সেই অনন্ত প্রেমেরই এক এক রূপ মাত্র—বিভিন্নজাতীয় সাধু মহাপুরুষ যাহা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা উহা প্রকাশ করিবার জন্য ভাষা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছেন—শেষে অতিশয় ইন্দ্রিয়পরতাসূচক শব্দগুলি পর্য্যন্ত তাঁহারা ঈশ্বরীয় ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন।

হিব্রু রাজর্ষি * এবং ভারতীয় মহাপুরুষগণও নিম্নলিখিতভাবে ঐ প্রেমের বর্ণনা ও কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। "হে প্রিয়তম, তুমি যাহাকে একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার দ্বারা একবার চুম্বিত হইলে তোমার জন্য তাহার পিপাসা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। তখন সকল দুঃখ দূর হইয়া যায়, আর সে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সব ভুলিয়া কেবল তোমারই চিন্তা করিতে থাকে।" ইহাই

* বাইবেলে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের সলোমনের গীত (Song of Solomon) দেখুন।

প্রেমের উন্মত্ততা—এই অবস্থায় সব বাসনা লোপ হইয়া যায়। প্রেমিক বলেন,—মুক্তি কে চায়? কে উদ্ধার হইতে চায়? এমন কি, কে পূর্ণত্ব বা নির্ব্বাণ পদের অভিলাষ করে?

আমি টাকা কড়ি চাই না, আমি আরোগ্য প্রার্থনাও করি না, আমি রূপযৌবনও চাহি না, আমি তীক্ষ্ণবুদ্ধিও কামনা করি না—এই সংসারের সমুদয় অশুভের ভিতর আমার বার বার জন্ম হউক—আমি তাহাতে কিছু মাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিব না, কিন্তু আমার যেন তোমাতে অহৈতুক প্রেম থাকে। ইহাই প্রেমের উন্মত্ততা—পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীতাবলীতে ইহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে, আর মানবীয় প্রেমের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই সর্ব্বোচ্চ, স্পষ্টা-ভিব্যক্ত, প্রবলতম ও মনোহর। এই কারণে ভগবৎপ্রেমের বর্ণনায় সাধকেরা এই প্রেমের ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষের এই মত্ত ভালবাসা সাধু মহাপুরুষগণের উন্মত্ত প্রেমের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি মাত্র। যথার্থ ভগবৎপ্রেমিকগণ ঈশ্বরের প্রেমমদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হইতে চান—তাঁহাদিগকে, 'ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ত পুরুষ' বলে। সকল ধর্ম্মের সাধু মহাপুরুষগণ যে প্রেমমদিরা প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহাতে নিজেদের হৃদয়-শোণিত মিশ্রিত করিয়াছেন, যাহার উপর নিষ্কাম ভক্তগণের সমগ্র মনপ্রাণ নিবদ্ধ, তাঁহারা সেই প্রেমের পেয়ালা পান করিতে চান। তাঁহারা এই প্রেম ছাড়া আর কিছুই চাহেন না—প্রেমই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার, আর এই পুরস্কার মানবের কি পরম লোভনীয়! ইহাই একমাত্র বস্তু, যাহার দ্বারা সকল দুঃখ দূর হয়, একমাত্র পানপাত্র, যাহা হইতে পান করিলে ভবব্যাধি দূর হয়।

তখন ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া যায়, আর সে যে মানুষ, তাহা ভুলিয়া যায়।

উপসংহারে বক্তব্য, আমরা দেখিতে পাই, এই সমুদয় বিভিন্ন সাধনপ্রণালী পরিণামে সম্পূর্ণ একত্বরূপ এক লক্ষ্যে পঁহুছাইয়া দেয়। আমরা চিরকালই দ্বৈতবাদিভাবে সাধন আরম্ভ করিয়া থাকি। তখন এই জ্ঞান থাকে যে, ঈশ্বর ও আমি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু! প্রেম উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ভগবান্‌ও যেন মানুষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। মানুষ পিতা, মাতা, সখা, নায়ক প্রভৃতি নানা সম্বন্ধ লইয়া ভগবানের উপর আরোপ করে, আর যখনই সে তাহার উপাস্য বস্তুর সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, তখনই চরমাবস্থা। তখন আমিই তুমি ও তুমিই আমি হইয়া যায়। তখন দেখা যায়, তোমার উপাসনা করিলেই আমার উপাসনা, আর আমার উপাসনা করিলেই তোমার উপাসনা হইল। সেই অবস্থায় যাইলেই মানব যে অবস্থা হইতে তাহার জীবন বা উন্নতি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই সর্ব্বোচ্চ ব্যাখ্যা পাইয়া থাকে। মানুষ যেখান হইতে আরম্ভ করে, তাহার শেষও সেইখানে হইয়া থাকে। প্রথম হইতেই তাহার আত্মপ্রেম ছিল—কিন্তু আত্মাকে ক্ষুদ্র অহং বলিয়া ভ্রম হওয়াতে প্রেমকেও স্বার্থপরতাদুষ্ট করিয়াছিল। পরিণামে যখন আত্মা অনন্তস্বরূপ হইয়া গেল, তখনই পূর্ণ আলোকের প্রকাশ হইল। যে ঈশ্বরকে প্রথমে কোন এক স্থানবিশেষে অবস্থিত পুরুষবিশেষ বলিয়া জ্ঞান ছিল, তিনি তখন যেন অনন্তপ্রেমে

পরিণত হইলেন। মানুষ স্বয়ং তখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যান। তিনি তখন ঈশ্বর-সামীপ্য লাভ করিতে থাকেন। পূর্ব্বে তাঁহার যে সমুদয় বৃথা বাসনা ছিল, তিনি তখন তাহা সব পরিত্যাগ করিতে থাকেন। বাসনা দূর হইলেই স্বার্থপরতা দূর হয়, আর প্রেমের চরমশিখরে গিয়া তিনি দেখিতে পান, প্রেম, প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক—এই তিন একই বস্তু।